আত্ম উপলব্ধি

লেখক:
মুহম্মদ কাজী আলমগীর

শেষ খেয়া প্রকাশন
হাউজ নং-২, হাজীপাড়া মসজিদ রোড
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

আত্ম উপলব্ধি

লেখক:
মুহম্মদ কাজী আলমগীর

প্রকাশকাল:
ফেব্রুয়ারি-২০১৯

প্রচ্ছদ:
গ্রাফিক্স গ্যালারী
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ:
ব্রাদার্স প্রিন্টিং প্রেস
৩/ ১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০।

একমাত্র পরিবেশক:
শেষ খেয়া প্রকাশন
হাউজ নং-২, হাজীপাড়া মসজিদ রোড
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল : ০১৭১২-১৩৯৩৬৭
E-mail : amd723046@gmail.com

স্বত্ব : প্রকাশক

মূল্য : ২৪০.০০ টাকা মাত্র।

বি: দ্র: প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনরুপ বিকৃতি সাধন, কোন যান্ত্রিক উপায়ে অনুবাদ অনুলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ বিষয়ের লঙ্ঘন নৈতিক, সামাজিক এবং আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ।

‘নিবেদন’

স্থান ও কালের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট ও সংগঠিত অসংগত-অযৌক্তিক, অন্যায়-অনৈতিক সকল প্রকার লড়াই, যুদ্ধ, আত্মকলহ, হানাহানি, নৈরাজ্য, অত্যাচার, অন্যায়, অবিচারে দেহত্যাগ করা মানুষদের আত্মাসমূহের জন্য (মহান স্রষ্টার যথার্থ করুনাসূচক দয়ায়) অসীম শান্তি ও মঙ্গল কামনা করছি।

১৯৭১ সালে সংগঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন-মুক্তিযুদ্ধে, নির্যাতিত নিপীড়িত, মাতৃভুমির জন্য আত্মপ্রান বিসর্জিত, নিরপরাধ লাখো লাখো বাংলাদেশি মানুষরূপি আত্মাদের জন্য মহান স্রষ্টা সমীপে যথার্থ শান্তি ও চিরস্থায়ী করুনা কামনা করছি।

স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির নেপথ্যে, নায়কগণ এবং মূল মহা-নায়কঃ

মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান, মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, সেক্টর কমান্ডারগণ, বিভিন্ন গেরিলা বাহিনী প্রধান এবং স্বাধীনতার মূল স্থপতি বাংলাদেশের প্রিয় নেতা, অকৃত্রিম বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য মহান স্রষ্টা-আল্লাহ্ সমীপে যথাযোগ্য ক্ষমা, শান্তি, সম্মান এবং শহীদদের উচু মর্যাদা প্রার্থনা করছি।

সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর সকল মানুষদের ‘মানুষ’ হিসেবে স্ব-উপলব্ধি কামনা করে নিজ নিজ ধর্মের বলয়ে ধার্মিক সমাজ জীবন এবং যথার্থ সত্যাশ্রয়ী উপলব্ধির মাধ্যমে; সঠিক-সংগত পরিপূর্ণ শান্তিময় সমাজ ও পৃথিবী কামনা করছি।

মুসলমানদের সকল পথভ্রষ্টতা, বিভ্রান্তি, দলাদলি বিসর্জনের মাধ্যমে সঠিক/যথার্থ মুসলিম হওয়ার সংকল্পে আপন বোধশক্তি জাগ্রত করার লক্ষ্যে মহান স্রষ্টা ‘আল্লাহ’ সমীপে ক্ষমা কামনায়, সকল প্রার্থনাগুলো নিবেদন করছি।

প্রকাশকের কথা

"আত্ম উপলব্ধি" বইটিতে উপস্থাপিত প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনা সত্যিকার ভাবেই যথার্থ এবং উপলব্ধিযোগ্য! মহান স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য হতে শুরু করে ন্যূনতম করণীয় প্রতিটি বিষয়ের উপস্থাপন অর্থপূর্ণ।

আমার নিকট বইটি ব্যতিক্রম মনে হয়! "একজন মানুষের ন্যূন্যতম করনীয়" অধ্যায়ের মূল ভাবটি যে কোন ধর্মাবলম্বী একজন মানুষের জন্য "অবশ্য করণীয়" বিষয় হতে পারে!

প্রকৃত অর্থে বলা যেতে পারে "আত্ম উপলব্ধি" দ্বারা বিশৃংঙ্খল এই পৃথিবীতে আমি আমার 'মানুষ' নামটি স্বার্থক করে ইহকাল ও পরকালে আত্মিক সুখ ও মুক্তি পেতে পারি।

স্রষ্টা 'আল্লাহ' আমাদের সহায় হোন।

প্রকাশক
শেষ খেয়া
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা
তারিখ : ১২/০২/২০১৯ইং

একক, অ-দ্বিতীয়
করূণাময়, অসীম দয়ালু, দাতা, পবিত্রতম, ক্ষমতাধর, সম্মানিত,
গৌরবান্বিত, অকল্পনীয়-সুন্দর, নিপুণতম, সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়,
পরাক্রমশালী, মহান স্রষ্টা
-'আল্লাহ্'
স্মরণে শুরু করছি ...

.....কে

"আত্ম উপলব্ধি" বইটি

'উপহার'

স্বরূপ প্রদান করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

প্রিয়, বিশ্বস্থ, বন্ধু, স্বজন...

.....

তারিখ:

মূল কথা

পৃথিবীতে বসবাসকারী 'ইসলাম' ধর্মের অনুসারীদের মতে, ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণ প্রচার, প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা প্রায় ১৫শত বছর পূর্বে। খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের মতে, তাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ২ হাজার বছর পূর্বে যিশু খ্রিস্ট দ্বারা (মুসলমানদের মতে, ঈসা আলাইহিসসালাম)। ইয়াহুদী ধর্মানুসারীদের মতে, তাদের ধর্মের প্রকাশ এবং প্রচার হয়েছে হযরত মুসা (আঃ) দ্বারা প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে (আনুমানিক)। হিন্দু ধর্মানুসারীরা নিজেদেরকে সনাতন বা প্রাচীন ধর্মানুসারী হিসাবে দাবি করে থাকেন। তাদের মতে হিন্দু ধর্মের প্রচার প্রকাশের সময়কাল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বা এর অধিক সময়/ বছর পুরোনো। বৌদ্ধ ধর্মের প্রকাশ প্রচার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধের দ্বারা।

বর্তমানে আমরা প্রতিটি ধর্মের উদ্ভব, প্রকাশ, প্রচার এবং উৎকর্ষতার সময় থেকে বহুদূরের সময়ে অবস্থান করছি। পৃথিবীর যে চিত্রটি আমরা দেখছি তাতে ধর্মহীনতার প্রকাশ প্রচার এবং এর প্রতিযোগীতা বৈ অন্যকিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমরা আজ আধুনিকতার সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করে মূলত ধর্ম বিমুখতার মাধ্যমেই কিছু অর্জন দ্বারা আধুনিকতার প্রকাশ ঘটাচ্ছি। আমাদের নৈতিক এবং ধর্মীয় যে অর্জনগুলো দ্বারা মনুষ্যত্ববোধের প্রকাশ ঘটতো বা ঘটা সম্ভব সে গুলো আমাদের জীবনে প্রকাশ, প্রচার এবং শোভা বর্ধন করে না। স্বাভাবিক সরল দৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের আধুনিক জীবন আমাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ধর্মানুসারীরা ধর্মের উদ্ভব, প্রচার এবং উৎকর্ষের সময় থেকে যেমন দূরে অবস্থান করছি, ধর্মের বাস্তবতা নীতি আদর্শ আমাদের মাঝে তেমনি দূরে রয়েছে বা কম প্রকাশিত, বাস্তবায়িত এবং অনুসৃত হচ্ছে। ধর্মগুলোর মধ্যে সত্য-মিথ্যা, ভাব-ভাবনার যৌক্তিকতা, গ্রহণযোগ্যতা, মানুষের জীবন ঘনিষ্টতায় উপযোগীতায়, যথার্থতা যাচাই করে আপন ধর্মের পিছনে কিছু সময় ব্যয় করা এবং ধর্মের মূল

বিষয়াদি অন্ত:স্থ করে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণে আপন স্রষ্টামুখি বিনীত হওয়া এবং মহান স্রষ্টা সমীপে একমাত্র সঠিক/ সুপথ কামনা করা (মহান স্রষ্টার মনোনিত পথ) আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক যন্ত্রসম মানুষদের ভাবনারও বাহিরে। আমাদের হতে ধর্মগুলোর যাবতীয় দূরত্বের কারণে, আধুনিকতার প্রচার এবং জীবনবোধে রং তামাশার যে বিচ্ছুরণ ঘটানো হচ্ছে তাতে ধর্মকে পুরোনো এবং অচল মনে হয়। আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক শহরগুলোর কোলাহল, ব্যস্ততা, বাস্তবতা আর রঙ্গায়িত জীবনের রঙ্গীন ঝলকানিতে উদ্বুদ্ধ মানুষগুলো স্বপ্ন দেখে ভোগ আনন্দের, স্বপ্ন পূরণের মাধ্যমে সন্তুষ্টি, তৃপ্তি খোজতেই দিন কাটায়। এরপর সারাদিন উল্লাস করে সন্ধে বেলায় আমার ঠিকই অনুধাবন করি, যা করেছি সবই ভুল এবং বৃথা।

জীবনকে উপভোগ করার আনন্দময়তা, বাস্তবতার বেড়াজালে যন্ত্রসম জীবন এবং সেই সাথে যে কোন মূহুর্তে পৃথিবী ত্যাগ করার নির্মম বাস্তবতা উপলব্ধির সাথে পরকালীন শাস্তি/ মুক্তির ধারণাবোধে অজনা গন্তব্যের করুণ বাস্তবতা, সব মিলিয়ে আমরা কেউ দোলাচল, দ্বিধা-দ্বন্দ, হাহাকার, অতৃপ্তি, শুন্যতা আর ভয়হীন জীবনে নিমগ্ন হতে পারিনা কখনোই। প্রয়োজন অনুভব করি পৃথিবীতে অর্জনের এবং প্রয়োজন অনুভব করি পৃথিবী পরবর্তী সময়ের জন্য।

বাস্তবিক অর্থে আমাদের কি করা উচিত? সত্যিকার কি উপলব্ধি ব্যতীত আমরা কখনোই সু-পথ পেতে পারব না এবং আমাদের জীবন জগৎ কল্যাণকর হতে পারে না। শুন্যতা আর 'আর্তি'তে আমাদের হৃদয়ের ভাঙ্গা মনোবল কিভাবে দূর্গম পথ পাড়ি দিতে পরিপূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে! তারই কিছু সংকল্পে .....

সম্মানিত পাঠক,

সম্পূর্ণ বইটি প্রতিটি পৃষ্ঠা সহকারে পড়ার জন্য বিনীত বিনীত অনুরোধ করছি। অন্যথায় লেখক সম্পর্কে বিরুপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যা চরম দুঃখজনক বিষয়। দয়া করে একবারে না হোক অসংখ্য/ একাধিক সময়ে হলেও পুরো বইটি পড়ার জন্য একান্ত অনুরোধ করছি। মহান সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্' আমাদের সাহায্য করুন।

সূচিপত্র

মহান স্রষ্টার বৈশিষ্টাবলী ১০
স্রষ্টা, ধর্ম, মানুষ ১৬
জীবন-মৃত্যু, দেহ-আত্মা ৩৯
আমাদের আধুনিক জীবনে ধর্ম ৭৪
মানুষ হিসেবে ন্যূনতম করণীয় ৯৫

অনিচ্ছাকৃত ভুল শব্দ, বাক্য এবং শব্দ বাক্যে স্ফলন ঘটিত ত্রুটি
কাহারো মনঃ কষ্ট, মূল ভাবটি অবোধগম্য হেতু ধর্মবোধে
আঘাত প্রাপ্তি, মানবীয় ক্ষমা কাম্য;
প্রয়োজনে পরবর্তী সংস্করনে সংশোধনের প্রত্যয়–
মুহম্মদ কাজী আলমগীর

মহান স্রষ্টার বৈশিষ্টাবলী

ভূমন্ডল নভোমন্ডল এবং এর মধ্যস্থিত সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ্'। তিনি মহা ক্ষমতাধর, মহা পরাক্রমশালী; যাহার মালিকানায় রয়েছে ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের রাজত্ব এবং নভোমন্ডলের বাহিরেও যদি কোন জগৎ বা অন্য কোন কিছু থাকে তাহলে তার মালিকানাও একমাত্র আল্লাহর। সকল ক্ষমতা ও প্রভূত্ব একমাত্র তাহারই। মহান আল্লাহতায়ালা সমস্ত কিছুর স্রষ্টা, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক এবং পরিশেষে সবাই তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে থাকে। স্রষ্টা হিসাবে ধ্বংশ করার ক্ষমতা তাহারই। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত জানেন। অতীতেও তিনি ছিলেন, বর্তমানে আছেন ভবিষ্যতেও একমাত্র তিনিই থাকবেন। তিনি ব্যতীত সবাই সৃষ্টি। সৃষ্টি হিসেবে সবাই ধ্বংশ বা বিলুপ্ত হবে কিন্তু একক, অদ্বিতীয় মালিক/ প্রভূ হিসাবে 'আল্লাহ' চিরস্থায়ী।

মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালার কোন আকার আকৃতি নেই তিনি নিরাকার কোন মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি/ অন্তর দ্বারা মহান আল্লাহর স্বত্তা সম্পর্কে কল্পনা করা বা ধারনা করা একেবারেই অসম্ভব।

মানুষ বা অন্যান্য সৃষ্টি অথবা যেকোন সৃষ্টির সহিত মহান আল্লাহতায়ালার কোন প্রকার সাদৃশ্য নেই। সৃষ্ট জীব বা মানুষের যত প্রকার প্রয়োজন থাকতে পারে আল্লাহ সে সব প্রয়োজনের বাহিরে। মহান 'আল্লাহ' সবকিছু দেখেন, সবকিছু শুনেন এবং সর্বত্র বিরাজমান রয়েছেন। তার দৃষ্টির বাহিরে কোন ফল আবরণ মুক্ত হয় না এবং কোন প্রকার প্রাণি গর্ভধারন/ গর্ভপাত বা কোন কিছুই করতে পারে না। ক্ষুদ্রাতি- ক্ষুদ্র প্রাণিদের পদচারনার শব্দ তিনি যেমন শুনেন তেমনি শুনেন বজ্রপাতের শব্দ। আমাবস্যা রাতে কোন জঙ্গলের অজানা কোন গর্তের গভীর অন্ধকারে ক্ষুদ্র প্রাণির পেটের অন্ত্র/ হৃদযন্ত্রের নড়াচরা তিনি যেমন দেখেন ঠিক তেমনি দেখেন প্রকাশ্য দিবালোকে কোন প্রকাশ্য প্রান্তরে কোন বিমানের বিধ্বস্ত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়াকে/ অথবা গ্রহ নক্ষত্রের ধারনাতীত গতিতে ছুটে চলা, সংঘর্ষিত হওয়াকে। সম্পূর্ণ সমান ভাবে ছোট বড় বা উচ্চ-নিম্ন শব্দের কোন পার্থক্য তার নিকট থাকে না। মহাপরাক্রমাশালী, মহা ক্ষমতাধর, মহা পবিত্র, মহা সম্মানিত, গৌরব বা মহান গৌরবের একমাত্র অধিকারী, অমুখাপেক্ষী আল্লাহতায়ালার প্রকৃত সত্তা, স্বরূপ সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন; কোন সৃষ্টির

নিকট তিনি তা প্রকাশ করেননি কেননা কোন সৃষ্টিই তার সত্তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের যোগ্য নয় এবং কখনই হতে পারে না। মহান সত্তা আল্লাহর স্বরূপ/ সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় এবং কোন সৃজিতের পক্ষে এটা শোভনীয়/ কাম্য হতে পারে না; শুধুমাত্র আনুগত্য ও স্মরণ ব্যতীত।

ক্ষমতা, বড়ত্ব, রাজত্ব, প্রভূত্ব একমাত্র আল্লাহর। পৃথিবীর কোন সৃষ্টিই কোন ভাবে সম্মানিত নয়, হতে পারে না এবং প্রকৃত যোগ্যও নয়। কোন সৃষ্টি পবিত্র হতে পারেনা কারণ তার সেই গুন নেই। সম্মান বড়ত্ব আর ক্ষমতার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন পবিত্র করেন, শুদ্ধ করেন সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সাময়িক ক্ষমতাবান করেন। এই ক্ষমতার মধ্যেও প্রকার রয়েছে।

আমরা যে ক্ষমতা বুঝি বা মনে করি এই ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি আর সম্মান মহান স্রষ্টার মনোনিত বা সন্তুষ্টি জনিত না ও হতে পারে। অথবা এইসব সম্মান ক্ষমতা প্রতিপত্তির দাপট প্রকৃত অর্থে অর্থহীনও হতে পারে।

মহান ক্ষমতাধর স্রষ্টা তার অসীম সত্তার সামান্য প্রকাশ ঘঠিয়েছেন তার পবিত্র নামের মাধ্যমে। 'আল্লাহ' নামটি মহান স্রষ্টার নিজ সত্তা, নিজ জাত নাম। এই পবিত্র নামটি বচন ও লিঙ্গভেদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। বিশেষ কোন 'ধাতু' হতে এই নামটি উৎপন্ন হয়নি। এবং কোন ভাষাতেই একে পাওয়া যায়নি বা উৎপত্তি হয়নি। মহান আল্লাহ তার প্রেরিত বাণী/ বাক্যের মাধ্যমে পবিত্র এই নামটি পৃথিবীবাসিদের নিকট প্রকাশ করেছেন। মহান সৃষ্টিকর্তার নিজ সত্তা, স্বকীয়তার, নিজ অস্তিত্বের বা তার নিজের অন্য কোন নাম নেই; 'আল্লাহ' নাম ব্যতীত। আল্লাহ্ নামটি মহান ক্ষমতাধর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্তায়ালার একক অদ্বিতীয় সৃষ্টিশীল এবং বড়ত্বের উদাহরণের প্রথম উদাহরণ হতে পারে। আল্লাহতায়ালার অন্য যেসব নাম রয়েছে সেগুলো গুণবাচক মাত্র; আল্লাহ নামের সহিত এসব নামের কোন তুলনা হতে পারে না। শুধু মাত্র আমাদের বোধগম্যতা এবং জ্ঞান দান করার জন্য অন্যান্য নাম সমূহের মাধ্যমে তার গুনাবলীর প্রকাশ করা হয়েছে। 'আল্লাহ' নামটির বৈশিষ্ট্য সংবলিত কোন নাম বা শব্দ পৃথিবীর কোন ভাষাতে কখনোই আবিষ্কৃত হয়নি এবং ভবিষ্যতে কখনো সম্ভবও হবে না। আল্লাহ নামটি নিয়ে আলোচনা গবেষনা করলেই আমাদের মাথা নত হতে বাধ্য। স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে মেনে নেয়া, স্বীকার করা এবং বাস্তব জীবনে তার

নির্দেশনাবলি ফুটিয়ে তোলার জন্য 'আল্লাহ' নামটি প্রথম এবং প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে, যদি আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

আমরা প্রায় প্রতিটি মানুষই শিক্ষিত বা মুর্খ, ধনী বা গরিব, সাদা বা কালো এবং বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী লোকেরা বিশ্বাস করি, স্বীকার করি, মহান 'আল্লাহ' আমাদের মতো মানুষদের এবং অন্যান্য প্রাণিদের যাদের সম্পর্কে আমরা জানি বা জানিনা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে তার যথোপযুক্ত আকৃতিতে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সৃষ্টি করে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করছেন। পৃথিবীস্থিত এসব প্রতিটি প্রাণির সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা ও মৃত্যুদাতা একমাত্র আল্লাহ। আমরা অধিকাংশই এসব মূল বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করি।

আল্লাহ পৃথিবীবাসী মানুষদের প্রতক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়োজনে আকাশ সৃষ্টি করেছেন, গ্রহ নক্ষত্র সমূহ সৃষ্টি করে নিজ নিজ কক্ষপথে বা স্থানে নিয়োজিত করেছেন এবং তিনি মানুষদের জন্য মানুষের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীস্থিত প্রাণিদেরকে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে সৃষ্টিকরে অঞ্চলভিত্তিক যথোপযুক্ত বৈচিত্রতা দান করেছেন; মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রয়োজনেই। ভূ-বৈচিত্র, প্রকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্রতা, ভাষাগত, আবহাওয়াগত তারতম্য তারই ক্ষমতার সামান্যতম প্রকাশ মাত্র।

পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাহিরের বিশাল সৃষ্টি সমূহের সামান্য বিবরণও যদি আমরা জেনে থাকি তাহলে আমাদের ভাবা উচিত শুধুমাত্র পৃথিবী নামক জগৎটিতেই লাখো কোটি প্রজাতির প্রাণির সচল ও নিশ্চল শ্রেণি, সমাজ ও জীবন প্রবাহের যে ধারা বিদ্যমান রয়েছে তার স্রষ্টা সঞ্চালক/ পরিচালক এবং সবশেষে একদিকে পুঞ্জিভূতকারী, প্রত্যাবর্তনে সঞ্চালন কারী কে?

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই বলবেন, মহান সৃষ্টিকর্তা!

তারপর ধর্মীয় মতাদর্শে বিভক্ত মানুষেরা বিভিন্ন ধর্মীয় নামে মহান স্রষ্টাকে অভিহিত করবেন। আমি যদি মহান স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' নামে নির্দিষ্ট করি তাহলে অধিকাংশ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিশ্চুপই থাকবেন, বিরোধীতা করবেন না।

কারণ কি?

কারণ হলো স্রষ্টার ব্যাপারে/ স্রষ্টাকে আহব্বান করার বিষয়ে সমস্ত মানুষদের মূল ভাবগত ধর্মীয় কোন বিরোধ/ সমস্যা নেই, শুধুমাত্র বাক্যগত/ শব্দগত বিরোধীতা

রয়েছে। পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তি/ দুরত্ব/ সঠিক বা ভুল ইত্যাদি যাবতীয় কিছুর শুরু এখান থেকেই।

বিষয়ই অবশ্যই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

পৃথিবীতে মানুষেরা একটি ক্ষুদ্র পরিবার সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সমাজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয় অথচ দায়িত্ব বলতে যা আমরা বুঝি তার কোনটাই নিজ সৃষ্টি নয় বরঞ্চ স্রষ্টার সৃষ্টির বন্টন, রক্ষণ, বর্ণন-বিন্যস্ত, পরিবর্তন বিবর্তনের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারে পাহাড়াদারি করার সারাংশে/ অবশেষে গলাধকরণ।

অথচ লাখো লাখো কোটি প্রাণির রক্ষণাবেক্ষনের আর আহার্যের সমস্ত দায়িত্বই এক মহান স্রষ্টা পালন করছেন অসীম ক্ষমতায়। পৃথিবীতে মানুষ নামক শ্রেণিটিকে তার বাসস্থান আর আহার্য্য নিয়ে এতটা বিচলিত ব্যাস্ত দেখে মনে হয় মানুষ তার নিজ আহার্যের মালিক বা তার প্রভূ সে নিজেই। অথচ আমরা মানুষেরাই স্বীকার করি/ বাধ্য হই যখন হোচট খাই জীবন যন্ত্রের গতি প্রবাহে। রোগ, শোক, ব্যর্থতা আর মনুষ্যশ্রেণির অমনুষ্যপূর্ণ আচরনের শিকার হয়ে পথ যখন শেষ হয়ে যায় তখন আমাদের মতো ক্ষমতাধর প্রতিটি পাপিরাই মাথা নত করি মহান স্রষ্টার স্মরণে।

আমাদের পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই তাদের নিজ নিজ পালনীয়/ অনুসরণীয় ধর্মের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালার প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন। ধর্মীয় বিধান পালন করেন, তাকে আহব্বান করেন, তার নিকট নানা রকম আবেগ অনুভূতি ও চাহিদার ভাব বাক্য প্রকাশ করে প্রার্থনা করে থাকেন। ন্যূনতম হলেও পৃথিবীর মানুষেরা তাদের নিজ নিজ ধর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্বীকার করে থাকেন; যদিও বেশিরভাগ ধর্মানুসারীরা তাদের নিজ নিজ ধর্মের যথাযথ অনুসরণ করেন না। এক কথায় বলা যেতে পারে মানুষেরা পৃথক পৃথক ধর্মমতের মাধ্যমে পৃথক ভাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করে থাকেন।

মুসলিম, খ্রীষ্টান, ইয়াহুদী ধর্মের অনুসারীরা মহান সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' নামে সম্বোধন করে প্রার্থনা করেন। এসব ধর্মাবলম্বীদের অনেকে ভাষাগত কারনে আল্লাহকে অন্য ভাষাভিত্তিক নামে উল্লেখ করে প্রার্থনা করেন। কেহ অন্যধর্মের (বিশেষত ইসলাম ধর্মের) প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণে 'আল্লাহ' নাম উল্লেখ না

করে তাদের সুবিধামত ভাষাভিত্তিক এক বা একাধিক নাম ব্যবহার করে মূলত 'আল্লাহ'কে আহবান করেন বলে নিজেরা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন।

বর্তমানে আলোচিত- ইসলাম ধর্মের সহিত খ্রীষ্টান এবং ইয়াহুদী ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য আমরা দেখছি আসলে তাহা উক্ত ধর্ম তিনটির "মহান প্রচারক" গণের দ্বারা হয়নি! ইয়াহুদী এবং খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারী সংস্কারক/ ধর্মগুরুদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে প্রধানতম এই তিনটিই একত্ত্ববাদের ধর্ম। কিন্তু ধর্ম প্রচারক নবী-দ্বয়ের পরবর্তী সময়ে ইয়াহুদী এবং খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা একত্ত্ববাদের মূল বক্তব্য/ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন।

মুসা (আ.) ঈসা (আ.) মুহাম্মদ (স.) প্রত্যেকে মহান আল্লাহর মনোনীত বিধান 'ইসলাম' প্রচার করে মুসলিম পরিচয় দিতেন। অজ্ঞতাহেতু, অনেক ইয়াহুদী খ্রীষ্টান বিষয়টি না জানতে পারেন, কিন্তু যারা জ্ঞানী তারা অবশ্যই জানেন। মুসলিমরা যেমন নামাজ রোজা ইত্যাদি পালন করেন তেমনি খ্রীষ্টান ইয়াহুদীরাও সালাত, রোজা, প্রার্থনা, সিজদা এবং নিরাকার স্রষ্টা সমীপে কান্না করেন! মুসলিমরা সব সময় টুপি পড়েন, ইয়াহুদী খ্রীষ্টানরা টুপি পড়েন শুধু প্রার্থনার সময়! ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও এই ধর্ম তিনটির মধ্যে মূল ইবাদত আনুগত্যের বাহ্যিক অসংখ্য বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে! যাহা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্বপক্ষে নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। সত্যিকারভাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহর একত্ত্ববাদের পথে একত্রিত করতে পারে যা উক্ত ধর্মগুলোর "মহান-প্রচারক" গণের মূল উদ্দ্যেশ্য ছিল।

বর্তমানের ইয়াহুদী এবং খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বিরা মহান সত্তা আল্লাহতায়ালার স্ত্রী/ পুত্রের উল্লেখ করে থাকেন। এমতাবস্থায় মুসলমানরা এটাকে মহান পবিত্রতম সত্তা আল্লাহতায়ালার পবিত্রতা ক্ষুন্ন কারী জঘণ্যতম উক্তি হিসাবে রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে এবং ঘৃণায় কান্না জড়িত কণ্ঠে আল্লাহর প্রতি বিনীত হন এবং আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা করতে থাকেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। যদিও খ্রীষ্টান ও ইয়াহুদী ধর্মানুসারীদের দৃষ্টিতে মহান পবিত্রতম সত্তা আল্লাহর প্রতি এমন বিবরণ (অপবাদকে) নিজেদের জন্য পূণ্যের কারণ এবং আল্লাহরই সন্তুষ্টির উপলক্ষ্য মনে করে উৎফুল্ল হন।

ইসলাম, খ্রিষ্টান, ইয়াহুদি ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য প্রায় প্রতিটি ধর্মগুলোতেই মূল মালিক/ স্রষ্টা আল্লাহকে স্বীকার করা হয় কিন্তু আল্লাহকে অন্য নামে বা

ভূষনে ডাকা হয়। এসব ধর্মে আল্লাহর সাহায্যকারী/ দায়িত্বপ্রাপ্ত/ ক্ষমতা প্রদত্ত এক বা একাধিক মালিক/ প্রভূ/ দেব-দেবীকে সাব্যস্ত করে তাদের নিকট প্রার্থনা, পূজা করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জনেই। ইসলাম খ্রিষ্টান ইয়াহুদি, বিশেষত ইসলাম ধর্মের সহিত এই ধর্মগুলোর মূল পার্থক্য হচ্ছে, ইসলাম স্রষ্টা আল্লাহতা'য়ালার শরিক/ সাহায্যকারী হিসাবে কাউকে স্বীকার করেনা বা ইসলামের মূল মর্মই হচ্ছে লা-শরিক আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার কোন শরিক নেই। কিন্তু অন্যান্য ধর্মগুলো শরিক/ অংশীদার সাব্যস্ত করে অনেক মালিকের মাধ্যমে মূল মালিক/ স্রষ্টা আল্লাহকে স্বীকার করে। এবং অনেকে সমার্থক মূল হিসাবে আল্লাহকেই মানেন। একাধিক দেব-দেবী/ প্রভূ/ স্রষ্টা স্থির করা এবং তাদের সন্তুষ্টি কল্পে প্রার্থনা/ পূজা/ আচার অনুষ্ঠান করাকে তাহারা মহান আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির উপলক্ষ্য বলে মনে করেন।

এসব ধর্মে দেবতা/ প্রভূদের/ স্রষ্টাদের মুর্তি বা প্রতিমা তৈরি করে তাদের স্মরণ অনুষ্ঠান বা প্রার্থনা অনুষ্ঠানকে সফল এবং যথার্থভাবে উপলব্ধিযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয় এবং তাদের তুষ্ট করার জন্য গীত, স্তুতি-বন্দনা করা হয়। উক্ত ধর্মাবলম্বীরা এসব নানা প্রকার লক্ষ্য-উপলক্ষ্য দ্বারা মহান আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবেন বলে দৃঢ়ভাবে আশা রাখেন। এভাবে মূর্তি/ প্রতিমা সংশ্লিষ্ট ধর্মগুলোতে মহান আল্লাহর রাজত্বে/ মালিকানায় অংশীদার, সাহায্যকারী, নিয়ন্ত্রণকারী, ক্ষমতা প্রাপ্ত দেব-দেবী বা প্রভূর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আমরা দেখছি মহান স্রষ্টার 'আল্লাহ' নাম নিয়ে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ অথবা হেয়, নিচ করার চেষ্টা। তারা মনে করছে (স্রষ্টা হিসাবে) আল্লাহ নামটি মুসলমানদের অথচ স্পষ্টভাবেই তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল কিতাবে 'আল্লাহ' নামটি স্রষ্টা হিসাবে উল্লেখ ছিল এবং তৎকালীন অনুসারীরা স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' সম্বোধন সহকারেই ইবাদত আনুগত্য এবং যাবতীয় প্রার্থনা করতেন।

অতীব লজ্জাকর বিষয় হচ্ছে আজ কথিত খ্রিষ্টান ইহুদিরা 'আল্লাহ' নামটি মুসলমানদের স্রষ্টার নাম হিসাবে অভিহিত করে এই মহা পবিত্র নামটির এমন বিরুদ্ধাচরণ করছে যা দেখে শয়তানও ভয়ে কান্না করছে।

হে মহান স্রষ্টা! হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করুন! পথ প্রদর্শন করুন!

স্রষ্টা, ধর্ম, মানুষ

আমাদের পৃথিবীর মানুষদের অনুসরণীয় ধর্মগুলোতে নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী মহান স্রষ্টা সম্পর্কে বিবরণ, ধারনাবোধ, বিশ্বাস, বিস্তৃত রয়েছে। বংশানুক্রমিকধারা, মানুষদের অঞ্চলগত ভাষাগত, সামাজিক শিক্ষা ও বেষ্ঠনীর নানাবিধ মাধ্যমে এর প্রচার হয়েছে। ধর্মগুলোর প্রাথমিক অবস্থায় তাকালে আমরা এই সুত্রে একাত্ম প্রকাশ করতে পারি, যে বা যাহারা সৃষ্টিকর্তাকে যে ধর্মের মাধ্যমে যেভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন বা করার নিমিত্তে চেষ্টা/ প্রচার করেছেন সৃষ্টিকর্তা সেই ধর্মের মাধ্যমে তাহাদের সেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে বিশাল বিভিন্ন রকম ধর্মাশ্রিত সমাজের প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। ধর্মগোষ্ঠীর বিশালতা, ব্যাপকতা, বিস্তৃত পরিসর অথবা ক্ষুদ্রতার বিষয়টি ধম-প্রচারকারী ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, গ্রহনযোগ্যতা, উপযোগিতা অথবা আঞ্চলিক, সামাজিক রাজনৈতিক সহায়তা দ্বারাও নিরূপিত হতে পারে। পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্য, ভারতীয় উপমহাদেশ, পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ন অঞ্চল এর অন্যতম/ একমাত্র উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এসব অঞ্চলেই পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোর আবির্ভাব ও উন্মেষ উৎকর্ষ ঘটেছে। ধর্মগুলোর মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্ব হয়েছে এসব অঞ্চলেই। বর্তমানেও এসব অঞ্চল ধর্মপ্রাণ মানুষদের পদচারনায় মুখর হয়ে রয়েছে। এমনকি অতীতের ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে বলা যেতে পারে, সম্ভবত এসব অঞ্চলেই কিছু মানুষদের ধর্মীয় অপক্ক উন্মাদনায় এবং শয়তানী ইন্ধনে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় নতুন করে ধর্মীয় সংঘাত ব্যাপকতর আকার ধারন করতে পারে।

অঞ্চলগত এবং ধর্মীয় বিরোধ মানুষদের মধ্যে যতই প্রবল থাকুক না কেন একত্ববাদ দ্বারা, বহুত্ববাদ দ্বারা, প্রতিমা দ্বারা, দেব-দেবী/ প্রভূ দ্বারা, জড় পদার্থের পূজা দ্বারা, প্রাকৃতিক কোন বস্তু বা স্থানের প্রতি পূজা প্রার্থনা করা দ্বারা পৃথিবীর মানুষেরা মহান স্রষ্টা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান। প্রায় প্রতিটি ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের এটিই মূল লক্ষ্য বলে আমি মনে করি। মানুষদের মধ্যে অবশ্যই ভুল ত্রুটি রয়েছে, ধর্মগুলোর মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান আছে। মূলনীতিগত বিরোধ আছে, ধর্মীয় বিধানে পার্থক্য আছে, বিধান পালনে বৈপিরত্য আছে, বিধানাবলি পালনের ফলে ইহকালিন উপযোগিতা অর্জনে ব্যাপক সন্দেহ আছে। (পরকালিন মঙ্গল লাভের বিষয় আপাতত বাদ রাখলাম) আছে সত্য মিথ্যার

পার্থক্য। আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতার দিক থেকে অসংখ্য ধর্মের মধ্যে অসংখ্য অসামঞ্জস্যতা রয়েছে তাতে ধর্মানুসারীদের মঙ্গলের চেয়ে স্থায়ী অমঙ্গলের বোঝা চেপে বসেছে। ভ্রান্ত ধর্মের ভ্রান্ত বিধানাবলি/ অনুশাসনে মানব সমাজের বৃহৎ/ কোন কোন অংশ আজ ডুবতে বসেছে, মনুষ্যত্বের বন্ধন হতে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। তদুপরি প্রতিটি ধর্মের মানুষেরা তাদের ধর্মের মাধ্যমে মহান মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় পৃথিবীতে এবং সত্যিকার সুখ শান্তি কামনা করে মৃত্যুর পরেও। যদিও মৃত্যুর পরে সুখ লাভের আশায় যথার্থ কোন কাজ করে না।

আমরা মুসলিম, হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, ইয়াহুদী, শিখ ইত্যাদি অথবা উপজাতীয় অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠির লোকেরা ব্যাপক স্বাতন্ত্র/ মূলনীতিগত ব্যাপক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকে বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রতিটি ধর্মের মানুষকে মহান স্রষ্টা অতি সুন্দর করে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, বড় করছেন, বাচিয়ে রেখেছেন, স্ত্রী-পুত্র, স্বামী পরিবার দান করেছেন, কর্মের মাধ্যমে ব্যাপকতর বৈচিত্রময় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করেছেন, তার সৃজিত বস্তু খাওয়াচ্ছেন, বিভিন্ন কার্যকারণ, বিভিন্ন উপলক্ষ্য সূত্রের দ্বারা আমাদের জীবনে হাসি, কান্না, ধনি, দরিদ্র, সুস্থ, অসুস্থতার ব্যবস্থা করেছেন এবং পরিশেষে তার নিকট আমাদেরকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন নানা উপায়ে। এসব কিছু বিষয়ে আমরা পৃথিবীবাসীরা ধর্মীয় বিভেদের বাহিরে মোটামুটি একমত।

আমরা প্রতিটি ধর্মাবলম্বিরা শয়তান সম্পর্কে জানি এবং বিশ্বাস করি যে, শয়তান একটি নিকৃষ্ট সৃষ্টি যার কাজ হলো মন্দ কর্মে মানুষকে উৎসাহ দেওয়া, মন্দকর্ম করানো এবং সবশেষে তাকে দুঃখে নিপতিত করা (ইহকাল এবং পরকালে)। এজন্য শয়তানকে ঘৃণা করে না, শয়তানি/ মন্দ কর্মকে ঘৃণা করে না এমন কোন লোক পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই।

আমরা সকলেই মহান স্রষ্টার নিকট হতে এসেছি এবং তার নিকট ফিরে যেতে হবে। সল্প সময়ের অবস্থান স্থল পৃথিবীর কর্মজীবন সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে এবং এর মাধ্যমে সুখ ভোগ বা কষ্ট ভোগ করতে হবে; এসব মতাদর্শে বিশ্বাস করে পৃথিবীর সকল ধর্মের অধিকাংশ মানুষই।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মের অধিকাংশ মানুষেরা বিশ্বাস করেন 'ভাগ্য' সম্পর্কে। ভাগ্যে 'আল্লাহ'/ স্রষ্টা যা কিছু লিখে রেখেছেন তা হবেই। জীবন, মৃত্যু, রিযিক, সম্পদ ইত্যাদি সবই প্রত্যেকের ভাগ্যে লিখা আছে। মানুষের নিজ নিজ স্ব-প্রণোদিত কর্ম ও কার্যকারণ দ্বারা এর প্রকাশ ঘটবে। সমস্ত মানুষ প্রার্থী, মহান

স্রষ্টা দাতা। মহান স্রষ্টা গ্রহণ করেন না তিনি শুধু প্রদান করেন। আমাদের ধর্মানুসারীদের মধ্যে এসব বিশ্বাস, বর্ণনা, বিবরণ ও বোধে প্রচুর মিল রয়েছে।

মানুষদের মধ্যে মূলনীতি, বিশ্বাস, পরকালীন ভাবনায় সংগতি থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় ভিন্নতায় আমরা পৃথিবীবাসী মানুষেরা যারা আজ নিজেদের সর্বাধিক সভ্য বলে দাবি করছি; তারা একে অপরের মুখোমুখি অবস্থায় দাড়িয়েছি। আমরা এক একটি ধর্মের অনুসারীরা আজ একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার দিকে এগুচ্ছি। আমরা আজ প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মের স্বপক্ষে বক্তব্য দিচ্ছি/ ধর্মের মোড়কে আচ্ছাদিত নিজ নিজ অপকর্মের স্বপক্ষে বক্তব্য দিচ্ছি/ প্রতিষ্ঠা করছি এবং আমার নিজ কর্ম, ধর্মকেই সঠিক সত্য এবং সফল বলে মনে করছি যদিও আমরা অধিকাংশই (শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ লোকও সম্ভবত) নিজ পালনীয় ধর্মের যথার্থ অনুসরণ করছি না।

এসব হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানার্জন, ধারনাবোধ, আবেগ এবং ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরির পিছনে অন্যতম জ্ঞানী শয়তানেরই একটা চক্রান্ত এবং সর্বোপরি আমাদের সত্য উপলব্ধি-হীন ধর্মজ্ঞান এবং (মূলত) ধর্মজ্ঞান হীনতা।

মানুষের প্রধান শত্রু 'শয়তান' সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সেই শয়তানকে বন্ধুত্বে বরণ করে, তার নির্দেশিত চিহ্নিত পথে ধার্মিক হওয়ার চেষ্টা করছি। অথচ প্রতিটি ধর্মে শয়তানের শয়তানি কলাকৌশল, চক্রান্ত এবং তার হতে দূরে থাকার জন্য আদেশ/ বর্ণনা/ বিবরণ রয়েছে।

আমরা শয়তানের সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে শয়তানি কর্ম/ মন্দ কর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে মন্দকর্ম পরিত্যগ করি না, একজন মানুষ হিসেবে নীতি, নৈতিকতা, আদর্শবোধ অর্জনের মাধ্যমে সৎ, সহজ, সরল এবং পরোপকারী জীবন গড়ার চেষ্টা করি না। আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় অন্যায়ের পথে চলি, অন্যায় উপার্জন করি, নিজের ভাল করা ছাড়া অন্য কিছু বুঝিনা, নিজের লাভের জন্য অন্যের ক্ষতি করতে কুণ্ঠাবোধ করি না। এসব অপকর্মের পাশাপাশি সামান্য কিছু সময় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে নিজেকে ধার্মিক মনে করি। আমি মনে করি আমার দ্বারা ধর্মের উপকার হচ্ছে, আমার অনুসরণীয় ধর্মের উন্নতি হচ্ছে, সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে দুর্ভাগ্য ভাবেই আমি শয়তানের হাতকে শক্তিশালী করছি, অন্যায় অসঙ্গত এবং আত্মবিধ্বংশী পথে এগুচ্ছি।

শয়তানকে বন্ধু হিসেবে বরণ করে, শয়তানি কর্মে ব্যপৃত থেকে, মন্দকর্ম, অসৎ জীবন, সত্য বিমুখ থেকে, অসৎ পথে অর্থ উপার্জন ত্যাগ না করে আমরা যতই

নিজ নিজ ধর্মের কট্টর অনুসারী হওয়ার চেষ্টা করি না কেন তাতে কোন ধর্মের কতটুকু লাভ হলো না ক্ষতি হলো সেটা ভাববার আগে আমাদের ভাবতে হবে যে, যে বিধানাবলী, যে নির্দেশনাবলী, সত্যিকার ধর্ম থেকে উদগত হয়েছে; যে বিধানাবলী দ্বারা পৃথিবীর মানুষের সত্যিকার মঙ্গল/ শান্তি সম্ভব, যে উদ্দেশ্য মহান সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের সহায়ক; সেই মহা-সত্য বিধানাবলীর ক্ষতি করছি কি না!

আমাদেরকে একটি মূল বিষয়ে একমত হতে হবে যে, আমাদের ধর্মগুলো ভিন্নতা ছিল, আছে এবং থাকবে। আমাদের দ্বন্দ্ব, চিন্তাভাবনার মধ্যে বিনয় নম্রতা ও আনুগত্য না থাকার কারনে আমাদের ধর্মগুলোর মধ্যে ধর্মযুদ্ধ বেধে যাওয়াও অসম্ভব হবে না বরং আমরা এই সম্ভবের দিকেই এগুচ্ছি। এসব দিকগুলো কৌশলে পরিহার করে আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান করতে হবে আন্তরিকভাবে। পথ প্রাপ্ত হয়ে লাখ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করা বা ধ্বংশ হওয়ার চেয়ে দিক ভ্রান্ত/ মন্দপথ প্রাপ্ত/ মন্দ কর্মে ব্যপৃত থেকে, বিচ্যুত হয়ে একশত লোক মৃত্যুবরণ করা, ধ্বংশ হওয়া অতিশয় দুঃখের।

মহান স্রষ্টা আল্লাহর অভিপ্রায়ও এমন। মহান 'আল্লাহ' চান মানুষ তার প্রিয় হওয়ার জন্য চেষ্টা করুক মাত্র। আল্লাহ প্রিয় করে নিবেন। মহান আল্লাহ চান মানুষ যেন তার চরম অবাধ্য না হয় এবং মানবের আত্মা যেন সত্য বিমুখ অসৎ না হয়। এমতাবস্থায় শয়তান এবং তার সেই সমস্ত মানুষ/ অনুসারীদের দিয়ে নরক/ জাহান্নাম/ অগ্নিকুন্ড পূর্ণ করবেন যারা শয়তান-সম এবং যাদের পথ পাওয়ার মতো ন্যূনতম অন্ত:করণ ও সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা না থাকলেও মানুষদের কর্মের কারণে এবং কুলষিত আত্মায় কলংকিত, নিকৃষ্ট ঘৃণিত, মানুষদের শয়তানের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করার ফলে মানুষদেরকে দিয়েই তার সৃজিত জাহান্নাম/ অগ্নিকুন্ড/ যন্ত্রনাদায়ক স্থান পূর্ণ করতে হবে (অনিচ্ছা সত্ত্বেও)।

মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং মন্দ পথ থেকে রক্ষা করেন!

আমরা কেন আল্লাহর অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজেরদের পরিচালিত করব না? আমরা কেন শয়তানের অনুসরণ করব?

ধর্মের কোন বাধা/ দেয়াল নেই। বাধা রয়েছে শুধু মাত্র মন্দপথ ও মন্দকর্মের। মন্দ/ খারাপ কাজ ত্যাগ করলে, খারাপ পথ ত্যাগ করলেই ক্রমান্বয়ে সেই

মানুষটি এমন একটি পথে চলে আসবে যাহাই একমাত্র সঠিক পথ। সুতরাং আমরা কেন মন্দকর্ম ত্যাগ করছি না?

আমরা কেন মহান স্রষ্টার আনুগত্য করব না! যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন! আমরা কেন ধর্মের পার্থক্যকে বড় করে দেখব?

আমরা কেন সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থী হয়ে তার নিকট বিনীত হব না? আসুন আমরা সমস্ত বাধা ছিন্ন করে ফেলার সংকল্প করি। একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার সমীপে তারই সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় বিনীত হই। তিনি যেন আমাদেরকে ধর্মের নামে অপ্রত্যাশিত বিভিন্ন রকম অধার্মিকতা থেকে রক্ষা করেন! সর্বোপরি তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথের ব্যবস্থা করে দেন!

আমরা আমাদের ভাব ভাবনা, নিজ নিজ ধর্মের মাধ্যমে অর্জিত স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসার যে অংশটুকু আমার মনে আছে, সেই ভালোবাসা, আন্তরিকতা, বিনয় নম্রতা আর আনুগত্যে চক্ষু নিংড়ানো কিছু কান্নার মাধ্যমে আমার হৃদয়ের আহাজারি, ধর্মীয় কামনা, ইহকালীন প্রয়োজন ও সফলতা ইত্যাদির জন্য মহান মালিকের প্রতি বিনীত হই এবং সত্যিকার সঠিক পথের সন্ধান কামনা করি; যে পথে চললে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

আমরা ধর্মের বিরোধ চাইনা, আমরা সত্যিকার সঠিক পথ চাই। আমরা শান্তি চাই ইহকালীন এবং পরকালীন। আমরা/ আমি যদি আমার নিজের স্রষ্টার প্রতি নিজে নিজে বিনীত হয়ে তার নিকটেই নিজেকে সমর্পণ করি এবং নীতি নৈতিকতা ও মানব চরিত্রের মানবিক যে বৈশিষ্টাবলী মানুষের মধ্যে থাকা দরকার তাহা পুরোপুরি অক্ষুন্ন/ বিনষ্ট না করে পৃথিবীর জীবনকে অতিবাহিত করার চেষ্টা করি, যে ধর্মেরই অনুসারী আমি হইনা কেন মহান স্রষ্টা অবশ্যই আমাকে/ আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন, সঠিক পথে আনয়ন করবেন এবং আমাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তিনিই সফল করবেন। মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকট বিষয়টি একেবারেই সহজ এবং এ নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও দ্বিধা থাকা উচিত নয়!

▶▶একটু ভেবে দেখুন, আমরা পৈত্রিক ভাবে, বংশগত ভাবে, জাতিগত ভাবে, মহান স্রষ্টার ইচ্ছাতেই পৃথিবীতে এসেছি; আমাদের নিজের ইচ্ছায় নয়। আমরা কেহ ইসলাম ধর্মে, কেহ খ্রীষ্টান ধর্মে, কেহ হিন্দু ধর্মে, কেহ বৌদ্ধ ধর্মে জন্ম গ্রহণ করেছি; আমাদের নিজের ইচ্ছায় নয় মহান স্রষ্টার ইচ্ছায়। পাপুয়া নিউগিনির জঙ্গল, আফ্রিকার জঙ্গল, আমাজানের কোন এক জঙ্গলে যেসমস্ত

মানুষেরা জন্ম গ্রহণ করছে, অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের রাজপরিবার ও সদস্যরা, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটরদের পরিবার ও সদস্যরা, মধ্যপ্রাচ্যের রাজ পরিবারদের/ আমিরদের পরিবার ও সদস্যরা, পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিরা এবং পরিবারের সদস্যরা, পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনী মানুষেরা এবং তাদের পরিবারের লোকেরা, তাদের মধ্যে যে পার্থক্য আর ব্যবধান রয়েছে তা কোন মানুষের সৃষ্ট নয়। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী 'আল্লাহ' প্রতিটি মানুষকে বিভিন্ন জাতি, গোত্র, ধর্ম ইত্যাদিতে পাঠিয়েছেন।

শিশু কিশোর থাকা অবস্থায় আমরা ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ কোনটাই কিছু বুঝিনা। এক্ষেত্রে আমার পরিবার বাবা-মা স্বজন সমাজ আমার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং আমি তাদের অনুসরণ করতে থাকি। আমি যখন বয়ঃ প্রাপ্ত হই পৃথিবীতে স্বভাবে যাতায়াত,বসবাস এবং কর্মক্ষমতা অর্জন করি, তখন আমার দ্বারা একটি সমাজ, ধর্ম, গোত্রের, জাতির প্রকাশ ঘটে। আমি হয়ে উঠি পৈত্রিক/ সামাজিক/ জাতিগতভাবে মুসলিম/ হিন্দু/ বৌদ্ধ/ খ্রিষ্টান ইত্যাদি ধর্মের অনুসারী; এবং বসবাস হিসেবে একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকি। আমাদের পিতা-মাতারা ধর্মের দৃঢ় অনুসারী বা ধার্মিক হলে তাদের জীবন দর্শনের শিক্ষা আমাকে দেওয়া হয় এবং আমি পিতা-মাতার ধর্মীয় বিধি বিধানের পরিপূর্ণ অনুসারী এবং ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শি হয়ে উঠি। এমতাবস্থায় আমাদের পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের নেতৃত্ব দান কারি মুসলিম আলেম, বুজুর্গ ব্যক্তিগণ, বৌদ্ধদের ভিক্ষু, খ্রিষ্টানদের পাদ্রি বা যাজক/ পোপ, হিন্দুদের পুরোহিত ব্রাহ্মন, সন্নাসী ইত্যাদি বিভিন্ন ধার্মিক লোকদের সৃষ্টি হয়।

পিতা-মাতা ধর্মীয় ভাবে সাধারণ হলে সন্তানেরাও অধিকাংশ সময় সাধারণ ধর্মাবলম্বী হয়ে গড়ে ওঠে। অধিকাংশ সময় তাদের সন্তানেরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মে ব্যপৃত হন এমতাবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার ব্যক্তিদের সৃষ্টি আমরা দেখতে পাই। তারা ধর্মীয় কর্মকান্ডে কমই অংশ গ্রহণ করে থাকেন। অনেকে শুধুমাত্র ধর্মের পরিচয় প্রদান করেন মাত্র। তাদের জীবনে ধর্ম মুখ্য হয়ে উঠেনা, কর্ম মুখ্য হয়ে প্রকাশ পায়।

মানুষদের জীবনের এই যে গতি প্রবাহ আমরা স্বাভাবিক ভাবে দেখছি এটাতো আল্লাহতায়ালারই সৃজিত। মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই এমন পথে এগুতে থাকে। তার জীবন পরিচালনা করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর হতেই। সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যতীত সবাই ধর্মীয় পথে না গিয়ে বৈচিত্রময়

কর্মজীবনের প্রকাশ করে সুন্দর সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখেন। এর মধ্যেও যারা ধর্মের আবহে জীবনকে পরিচালনায় অগ্রসর হন তারাও অনেকে সুদীর্ঘ জীবন পরিচালনার বাস্তবতায় ধর্মের মূলনীতি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভেজাল ধার্মিক জীবন পরিচালনায় বাধ্য হন অনিচ্ছা সত্ত্বেও। বাস্তব আর বর্তমানের যান্ত্রিক পৃথিবীতে সবাই আপন প্রয়োজন পূর্ণ করতে ব্যস্ত হয়ে পরেন। মানুষ স্রষ্টাপদত্ত জীবনের জন্যই ব্যতিব্যস্ত রয়েছে! আবার ধর্মের কাজ কখন করবে!

অসংখ্য ধর্মের দামাঢোল! এক এক ধর্মের এক এক রকম বিধিবিধান, কোনটা সঠিক! কোনটি মিথ্যা! কোন ধর্মের বিধান পৃথিবীবাসী মানুষদের জন্য সংর্বাঙ্গীন মঙ্গল জনক?

এই যে এত বাক্যাবরণ, বিভিন্ন ধর্মের বিধানাবলী, নির্ভেজাল এবং ভেজাল ধর্ম ভীরুদের নিজ নিজ বক্তব্যের পিছনে জীবন বাজি রাখার মতো সাহসিকতা আর চ্যালেঞ্জ! সামগ্রিক ভাবে ধর্ম, ধর্মগুলোর বক্তব্য এবং আমাদের বর্তমান আধুনিক পৃথিবীতে জীবন নির্বাহের কঠিন বাস্তবতা আমাদেরকে একক ও সমষ্টিগতভাবে ভাবিয়ে তুলেছে!

অনেক সময় আমরা মনে করি এটাতো আমাদের দ্বারা হয়নি, স্রষ্টা আল্লাহর দ্বারাই হয়েছে! এত জাতি, এত ধর্ম, এত বিভেদ, লড়াই, সবইতো আল্লাহর সৃষ্টি! সকল ধর্মই কি সঠিক নয়?

নাকি একটি ধর্ম সঠিক অন্যগুলো বিচ্যুত! যদি অন্যায় হয় অন্যায়টা কার? উত্তরটি পেতে অনেকে এমন দিকে চলে যান বা এমন উত্তরের দিকে ধাবিত হন যাহা চরম অন্যায়। এমন অন্যায় ভাবে পথভ্রষ্ট হচ্ছি আমরা কোটি কোটি মানুষেরা; সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা বশত। মহান 'আল্লাহ' আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করুন!

মহান, পরাক্রমশালী আল্লাহর অসীম সম্মান ইজ্জত আর বড়ত্বের কসম করে বলছি (যে বড়ত্ব, যে সম্মান, যে ইজ্জতের বর্ণনা সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সমষ্টিগতভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকাশ করতে থাকে তবু লাখো কোটি ভাগের এক ভাগও বর্ণনা করা সম্ভব হবে না) আল্লাহর ইচ্ছাটা এমন যে, পৃথিবীর মানুষেরা তার সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবুক, কিভাবে সে এসেছে, কোথায় আছে, জীবনের সারমর্ম কি, এবং পরিশেষে কোথায় সে প্রত্যাবর্তন করবে! সে চিন্তা করুক তার দেহ সম্পর্কে, চিন্তা করুক তার আত্মা সম্পর্কে এবং পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টি সম্পর্কে।

সে চিন্তাভাবনা করুক; যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন! পৈত্রিক, পারিবারিক, সামাজিক ভাবে প্রাপ্ত ধর্মের বিধানাবলী যতটুকুই সে পালন করুক না কেন তার ভাবনাটা যেন সত্যানুসন্ধানী হয়, অন্ত:করণের দ্বারা যেন বিনীত হয় নিজ স্রষ্টার প্রতি। তার সার্বিক সত্যাশ্রয়ী আচার আচরণ তাকে আরোও বিনীত করে দিবে নিজ মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি। মানুষ তার আপন স্রষ্টা সমীপে নিবেদন করুক তার দুঃখ কষ্ট, খুজতে থাকুক তার নিজের প্রভুকে। অকৃত্তিম চোখের পানিতে সে নিজ মালিকের সমীপে আপন ক্ষদ্রতায় সিক্ত হোক!

মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ' তার নিজ করুনায় এমন ব্যক্তিদেরকে সরল পথের ব্যবস্থা করে দিবেন। তার সৃজিত সৃষ্টিকে প্রিয় করে নিবেন, শুদ্ধ করবেন, যে ধর্মেরই সে অনুসারী হোক না কেন! মহান 'আল্লাহ' তার নির্ধারিত, নির্দেশিত পথে প্রার্থনাকারীকে নিয়ে আসবেন। সেই মানুষটি যত দুর্বোধ্য ও জটিল সময়, স্থান, কাল এবং পরিস্থিতিতে অবস্থান করুক না কেন!

মনে করুন কোন ব্যক্তি অন্যায় আত্যাচার অথবা অন্যের অপকর্মহেতু চরম দুর্দশাগ্রস্থ অথবা ব্যক্তি জীবনে এতটা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ যার ফলে পৃথিবীর জীবন বিষাদপূর্ণ অথবা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে কেহ এত অত্যাচার করেছেন যার ফলে তার বেচে থাকা অথবা মুক্তি পাওয়া চরম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মূল বিষয় হিসাবে আমি বুঝাতে চাইছি যে, আপনি যত প্রকার সমস্যাগ্রস্থ/ বিপদযুক্ত/ অত্যাচারিত হোন না কেন, মনে প্রাণে স্রষ্টা মুখি হওয়ার চেষ্টা করুন! প্রার্থনা করুন! মানব চরিত্রের খারাপ দিক গুলো পরিহার করার চেষ্টা করুন। সর্বোপরী বলা যায় মানুষের দৃষ্টিতে এবং জ্ঞানে, ব্যক্তিটি যত অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকুক না কেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌তায়ালার দায়িত্ব হয়ে পড়বে তাকে আলোতে আনার/ পথ প্রদর্শন করার!

রাশি রাশি বই, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োজন এখানে পরবে না। কিভাবে পথ প্রাপ্ত হবেন, কিভাবে সম্ভব হবে, এসব ভাবনা সম্পূর্ণ হীন মানষিকতা এবং শয়তানী বিভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। একটু ভেবে দেখুন সম্ভব-অসম্ভব, সাধারণ-অসাধারণ, মূল্যবান-মূল্যহীন, উত্থান-পতন ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি! আমাদের মানুষদের জানার মধ্যে বা জ্ঞানের আওতায় এই সৃষ্টি জগতের কতটুকুই বা আছে! আমরা মানুষদের অবস্থাইতো পৃথিবীর সকল সৃষ্টির চাইতে করুন ও অসহায় অবস্থায় ছিল কিন্তু আমরা পূর্ণতায় সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছি!

পৃথিবীস্থিত স্থাবর সৃষ্টিগত, মনুষ্যসৃষ্ট বস্তুগুলো নিয়ে আলোচনা করলে আমরা আশ্চর্য্য হই। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের পিরামিড কিভাবে নির্মিত হয়েছে বর্তমান স্থাপত্যবিদরা অবাক হয়ে যান। তাজমহল কিভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব হলো অথচ বর্তমানে এরূপ নির্মানশৈলী এবং কারুকার্য্য সম্পন্ন ভবন নির্মাণ করা প্রায় অসম্ভব মনে হয়! তখন কিভাবে এরূপ ভবন নির্মান করা সম্ভব হয়েছিল!

মসলিন শাড়ী বাঙ্গালীরা নিজেদের তাঁতে সুতা তৈরি করে, নিজ হাতে তৈরি করত। অথচ বর্তমানে মসলিনের মতো কোন কাপড় পৃথিবীতে তৈরি করা সম্ভব হয়নি এবং মানুষের হাতে তৈরি করার বিষয়টা সম্পূর্ণ দূঃসাধ্য বোধ হয়। এসব মানুষের মাধ্যমে, মানুষের দ্বারা, সম্ভব অসম্ভবের গল্প মাত্র।

চেঙ্গিসখানের মত দূধর্ষ যোদ্ধাবাজ শাষক ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেল! এটা কতটা অনভিপ্রেত এবং অসঙ্গত ভেবে দেখুন! পৃথিবীর এত আবিষ্কার, অর্জন, নানা প্রকার খণিজ দ্রব্যের মজুদ পূর্ব থেকেই ছিল, তৎকালীন শাসকদের কোনটা সম্পর্কে জানা ছিল কোনটা সম্পর্কে ছিল না। বর্তমানে মূল্যবান বস্তু সামগ্রী, খণিজ সামগ্রী, অতীব প্রয়োজনীয় মূল্যবান পদার্থগুলো এমন একটা সময়ে যার কোন মূল্যই ছিল না অথচ আজ তা মূল্যবান। জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং নানা প্রকার গবেষনার দ্বারা আমরা আজ যা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি ইতঃপূর্বে এরূপ সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর যে সমস্ত ভূখন্ডের মূল্য আজ অসম্ভব আকাশ চুম্বি এমন একটা সময় ছিল যখন এসমস্ত ভূখন্ডের কোন মূল্যই ছিল না। বর্তমান আবিষ্কার আর অর্জনগুলো আজ হতে চার/ পাঁচশত বৎসর পূর্বের মানুষদের নিকট যদি ভবিষ্যত হিসাবে বলা হতো তাহলে তারা অসম্ভব কল্পনা হিসাবেই উপস্থাপনা কারিদের কে পাগল আক্ষা দিত এবং দূরে তাড়িয়ে দিতো।

ইন্টারনেট ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তির বাস্তবতা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অর্জন, চিকিৎসা ও মহাকাশ বিজ্ঞান আমাদেরকে যে ভাবে আধুনিক মানব জাতিতে পরিণত করেছে তাহা আসলে পূর্বেই উল্লেখিত আলোচিত এবং উপলব্ধি যোগ্য ছিল কিন্তু আবিষ্কৃত ছিল না, হয়নি।

মানব সমাজ এবং মানুষদের বিচিত্র জীবন ব্যবস্থা, জীবন ধারনের অতীত এবং বর্তমান যে বৈচিত্রতা আমরা দেখতে পাই তা আসলেই মানুষদের নিকট মূল্যবান বা মূল্যহীন হতে পারে, সম্ভব-অসম্ভবের গল্প হতে পারে, কিন্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকট এগুলোর মূলত কোন গুরুত্ব, গ্রহনযোগ্যতা কোনটাই নেই।

ধর্মের ভিন্নতা, ধর্মীয় মতপার্থক্যের ব্যাপকতা মূলত শয়তানের দ্বারা সুসজ্জিত, বিন্যস্ত, মানুষের নিকট উপস্থাপিত এবং মানুষের নিকট গ্রহণ যোগ্য করে তোলার জন্য নানা প্রকার কর্মকান্ডের মিথ্যে যৌলুসে তৃপ্ত হওয়া। উদাহরনে বলা যায় বিশেষ প্রাণির ডিম্ব সদৃশ্য। যার শুরু, বর্তমান, শেষ, কথার কথা মাত্র, সম্পূর্ণ অর্থহীন উদাহরণ।

মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ' তার স্বাভাবিক সৃষ্টি পরিচালনা এবং শেষ, চালু রেখেছেন এবং মানুষদের যাবতীয় কার্যকলাপ, কর্মকান্ড সবই তার আপন স্ব-দৃষ্টির সামনেই হচ্ছে। তিনি তার মনুষ্য সম্পর্কিত বিধানাবলী, নির্দেশনাবলীর মাধ্যমে মানুষদের মঙ্গলার্থে নির্দেশিত সবকিছু করেন। আমাদের নিকট একশ বছর বিশাল সময় মনে হয় কিন্তু আল্লাহর নিকট নির্দিষ্ট দিনের একদিন আমাদের এক হাজার বছরের সমান।

▶▶ আমাদের নিকট পৃথিবীতে একটি হেলিকপ্টার/ একটি বিলাসবহুল গাড়ী, একটি বাংলো বাড়ী এক বা একাধিক সুন্দরী স্ত্রী বা পুরুষ সঙ্গী যার রয়েছে তৃপ্তিকর যৌন ক্ষমতা, এবং যার রয়েছে পর্যাপ্ত সম্পদ আর সু-স্বাস্থ্য ইত্যাদি মূল্যবান বা অতীব কাম্য। মহান আল্লাহতায়ালার নিকট এসবের সমষ্টি এবং সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত পৃথিবীর মানুষদের কাম্য সম্পদের সমষ্টি এবং পৃথিবী; একটি ক্ষুদ্র প্রাণি মশার পাখার সমতুল্যও নয়। অর্থাৎ একটি মশা মানুষের নিকট অবশ্যই মূল্যহীন অথচ স্রষ্টা আল্লাহর নিকট 'মশা'ও মূল্যবান; যতটা না মূল্যবান উপরোক্ত বর্ণনার বিষয়গুলো।

পৃথিবীবাসী বিজ্ঞানীরা তাদের আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবী এবং মহা নভোজগৎ সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন কিন্তু আমরা কখনই হৃদয় দিয়ে বুঝার চেষ্টা করি না। আমাদের এই পৃথিবীর মত লাখো কোটি কোটি অগনিত গ্রহ, নক্ষত্র বা অন্যান্য সৃষ্টি (যা সম্পর্কে আমরা জানিনা) বিশাল মহা শূন্যে কোন মাধ্যম ব্যতীত ঝুলন্ত অবস্থায় গতিশীল রয়েছে। এবং সমষ্টিগত ভাবে এসব কোটি কেটি গ্রহ নক্ষেত্রের জগৎ একদিকে অকল্পনীয় দ্রুতগতিতে (নদীর স্রোতের ন্যায়) প্রবাহিত হচ্ছে। বিশাল নভোমন্ডলে আমাদের পৃথিবীর অবস্থান একটি ফুটবল মাঠে একবিন্দু বালিকনার চেয়েও ক্ষুদ্র। হয়ত আমার উদাহরণ বড় হয়ে যাচ্ছে!

পৃথিবীর বাহিরের জগৎ সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে যা জেনেছি তাতে সূর্যসহ আনুমানিক ১০ হাজার কোটি তারকার স্বমন্ময়ে গঠিত জগতকে জৈর্তিবিজ্ঞান/

জৈর্তিবিজ্ঞানীরা ছায়াপথ বলে অভিহিত করে থাকেন। ছায়াপথ হচ্ছে, তারকারাজি ও নিহারিকার পারস্পরিক আকর্ষনের ভিত্তিতে (এবং তৎসহ বিশাল শুন্য একটি অঞ্চলের) ঘূর্ণিয়মান বিশাল একটি জগৎ। জৈর্তিবিজ্ঞানীরা একটি ছায়াপথের পরিধি/ সীমানা নির্ধারণ করেন একটি আলোক বৎসর দ্বারা। সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল আলোর গতির সাপেক্ষে ১ বছরে আলোর অতিক্রমকৃত অঞ্চলকে আলোক বৎসর বলা হয়। জৈর্তিবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, একটি ছায়াপথের পরিধি এমন ১শত হাজার বা ১ লক্ষ আলোক বৎসরের সমান। নভোমন্ডলে ছায়াপথ কেবল একটি নয় কয়েকশ কোটি থেকে কয়েক লক্ষ কোটি হতে পারে। যার প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র মহা স্রষ্টা, মহানিয়ন্ত্রক, মহান পালনকর্তা 'আল্লাহ' ব্যতীত কোন সৃষ্টি অবগত নহে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার নিয়ে ভাবলে মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালার ক্ষমতা বড়ত্ব এবং স্রষ্টা হিসেবে তার স্থান কোথায় হওয়া উচিত তা আমরা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সামান্য হলেও অনুধাবন করতে সক্ষম হবো।

ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রে সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্র, সর্বাধিক পারমানবিক অস্ত্রের অধিকারী রাশিয়া, উদীয়মান গণচীন আর ইন্ডিয়া নিয়ে ভাবনা থেমে যাবে। আর এসবের ক্ষমতাধর শাসকদের নিয়ে আলোচনা! আমাদের স্বপ্ন বাড়ী গাড়ী আর ভোগ বিলাস! এসবের জন্য হানা হানি, হত্যাযজ্ঞ, মিথ্যাচার, অসৎ পথ অবলম্বন, কত ক্ষুদ্র! কত ক্ষুদ্র! কত ক্ষুদ্র! একটু ভেবে দেখবেন কি?

আমরা আজ এসব মিথ্যে অহমিকা, মিথ্যে ভোগ সম্ভার, মিথ্যে ক্ষমতার বড়াই, মিথ্যে লোভ লালসার পিছনে ছুটে যা অর্জন করতে যাচ্ছি তা খোজার জন্য, বোঝার জন্য বেশি দূরে যেতে হবে না। একটু অতীতের দিকে তাকালেই বুঝতে পারব অসংখ্য দুনিয়ালেলুপ, ভোগবাদী ব্যক্তি, শাসক, এবং দাম্ভিকদের পরিণতি কি হয়েছে! তাদের কোন নিশানা আছে কি? তাদের আবাস স্থল গুলোর দিকে লক্ষ্য করা উচিত! আমরা বুঝার চেষ্টা করি। কারণ বর্তমানে আমরা এত জ্ঞানবান, এত পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করি যা ইতঃপূর্বে কেউ হয় নি! পৃথিবীতে কে কোন ধর্মের অনুসারী, কে ধনী, কে গরিব, কে কালো, কে সাদা, কে বড়, কে ছোট, কে গ্রাম্য, কে শহরের, কে শাসক, কে প্রজা ইত্যাদির যে প্রকাশ আমরা দেখি তা মানুষের জীবনের মূল পরিচয় হতে পারে না এবং পৃথিবীতে উৎকৃষ্টতর জীবন লাভের/ সুখ লাভের স্বপ্নই মানুষদের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর ইচ্ছা এমন নয় যে,

মানুষ এত ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যে অন্যান্য পশু, পাখিদের মত তার মূল্যবান আত্মা এবং দেহকে ব্যয় করুক!

▶▶ মহান আল্লাহর ইচ্ছা, মানুষ তার অন্তঃকরণ দ্বারা যেন তার নিজ স্রষ্টার প্রতি বিনয়ী হয়, তার সন্ধান করে, নিজ সৃষ্টির এবং পৃথিবীর সৃষ্টি সমূহের প্রতি লক্ষ্য করে। এসবের স্রষ্টার প্রতি ভাবনায় ব্যকুলতায় সে খুজতে থাকে অসীম সত্তাকে এবং সত্যিকার ভাবে সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থী হয় আপন মালিকের নিকট। যা কিছু উত্তম সৎ এবং যৌক্তিক, সেসবকে সে যেন উত্তম মনে করে এবং সঠিক সত্যাশ্রয়ী জীবন যেন সে কামনা করে। এটাই জীবনের মূল বিষয়। ধর্মের এত ভিন্নতা মতবিরোধ কোন বিষয়ই নয়। এত ধর্ম থাকবেও না যদি মানুষগুলো সত্যানু-সন্ধানী হয় স্ব-স্ব বুদ্ধি বিবেক দ্বারা! তার আপন স্রষ্টাকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে যৌক্তিক ভাবে স্মরণ করে বিনীত হয়।

এমতাবস্থায় সকল মানুষ এমন একটি পথে চলে আসবে নিজেদের অজানাতেই; যে পথে মহান স্রষ্টার আনুগত্য ব্যতীত কিছু নেই। কিন্তু আমরা আজ মিথ্যের পিছনে ছুটছি, যার কোন মূল্য নেই; যার উৎস মিথ্যা ফলাফল মিথ্যা। যার কোন প্রকার ফলাফল মানুষের জন্য এক বিন্দু পরিমাণ কল্যাণ করতে পারে না এবং পারবেও না।

আমরা আজ শয়তান প্রদর্শিত ধ্বংসাত্বক পথে চলছি, নিজেদের ধ্বংস দেখার পরেও সেই পথেই এগিয়ে চলছি আরও দ্রুত গতিতে। নিজেরা শুদ্ধতার পথে না এগিয়ে ধর্মানুসারী হিসাবে ধর্মের উপর দায় চাপাচ্ছি। অন্যায় ভাবে আইন বহির্ভূত হত্যা, চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, দূর্নীতি, মিথ্যা বলা, মাপে কম দেওয়া, নগ্নতা, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ, অন্যের সম্পদ হরণ করা ইত্যাদি; কোন ধর্মের বিধানে আছে?

কোন ধর্মে এসবের পক্ষে সামান্য হলেও অনুমোদন আছে? কেউ কি জানাতে পারবেন? আমরা আজ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্টতায় চলে এসেছি; কিন্ত আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা মানুষেরা আজ স্বেচ্ছা যৌনক্রিয়া, সমকামিতা আর পারস্পরিক সম্মতিসূচক বিবাহ-বহির্ভূত যৌনক্রিয়াকে বৈধতা দিয়ে মানব স্বাধীনতার বন্দনা করছি। নিজ দেহকে পণ্যে পরিণত করে নিজেকে বিকাচ্ছি। অর্থকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে ফেলেছি টাকা/ অর্থ উপার্জনকেই মানব জীবনের মুল লক্ষ্য হিসাবে স্থির করে নিয়েছি। অথচ এসব অসামাজিক, অনৈতিক কর্ম হিসাবে প্রতিটি ধর্মের নীতি বিরুদ্ধ কাজ!

উনিশ শতকের পূর্বে সংগঠিত বৃহৎ বৃহৎ যুদ্ধ নামক মনুষ্য নিধনলীলা গুলো বাদ দিয়ে, আমাদের নিকট অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ; কি কারণে সংঘটিত হয়েছিল?

মিথ্যে কিছু অহংকার, দম্ভ আর কুৎসিত মানষিকতার কারণেই কিছু আলোচিত ব্যক্তিদের কারণে এই যুদ্ধগুলোতে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে। কোন ধর্মের কারণে এসব যুদ্ধ হয়নি, কোন ধর্ম এগুলোকে সমর্থনও করেনি।

উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কোরীয় উপদ্বীপের যুদ্ধ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইরাক-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ, আফগান-রাশিয়া যুদ্ধ, চেচেনিয়া-রাশিয়া যুদ্ধ, ফিলিপিন-মিন্দানাওয়ের লড়াই, তামিল টাইগারদের লড়াই, কলম্বিয়ান ফার্ক যোদ্ধাদের লড়াই, চে গুয়েভারা এবং ক্যাষ্ট্রোদের লড়াই, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধ, আফগান-রাশিয়া যুদ্ধ, বর্তমানে চলমান অসংখ্য যুদ্ধ-লড়াই যেমন, যুক্তরাষ্ট-আফগান যুদ্ধ তথা সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জোটের যুদ্ধ, কাশ্মির-ইন্ডিয়ান যুদ্ধ, ইসরাইল-ফিলিস্তিন লড়াই, যুক্তরাষ্ট্র-সিরিয়া-রাশিয়া-ইসরাইল-কুর্দিস্তান-ইরাক-আইএস লড়াই, সিরিয়ার আভ্যন্তরীন লড়াই, শিয়া-সুন্নিদের লড়াই ইত্যাদি।

ইত্যাদি অসংখ্য যুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোটি কোটির অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এবং শত শত কোটি মহান আল্লাহর সৃজিত নিরপরাধ অন্যান্য প্রাণি সমষ্টির ধ্বংশ সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কি কারণে এত ধ্বংস, এত হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে?

শুধুমাত্র ধর্মহীনতা, অমানবিকতা, নৈতিকতা বিবর্জিত লোভ লালসা, মিথ্যে ক্ষমতার মোহ, মানবিকতা বর্জিত মনোভাব বিশিষ্ট কিছু মানুষদের কারনেই এসব যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, হচ্ছে এবং নিরপরাধ কোটি কোটি মানুষকে মৃত্যুর শিকার হতে হয়েছে। বর্তমানে ক্ষমতাধর সম্মানিত আলোচিত রাষ্ট্র প্রধানরা যদি তাদের নিজ নিজ ধর্মের স্থান হতে যথার্থ ধার্মিক হতেন তাহলে পৃথিবীর বর্তমান এই নৈরাজ্যকর অবস্থা, হানাহানি, হত্যাযজ্ঞ এবং অনৈতিক ব্যবসাযজ্ঞের আয়োজন আমরা দেখতাম না।

▶▶ প্রশ্ন উঠতে পারে আমি কেন ধর্ম যুদ্ধগুলোর কথা বাদ দিলাম অথবা ধর্মকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে সংগঠিত যুদ্ধগুলোতে আহত-নিহতদের বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছি কেন!

উত্তরগুলো এমন– ধর্মের নাম নিয়ে যুদ্ধ করলেই তা শতভাগ সঠিক বা ধর্মযুদ্ধ হবে না। ধর্ম যদি বিচ্যুত হয় অথবা 'ধর্ম' ভুল হলে এমতাবস্থায় ধর্মযুদ্ধ হলে, ধর্মযুদ্ধও ভুল/ অন্যায় হতে পারে। এই সম্ভাবনাও রয়েছে। এসব বর্ণনা দুটো কথায় শেষ করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

মুহাম্মদ (সঃ) এবং উনার চারজন খলিফা বা মনোনিত শাষকগণ,

ঈসা (আঃ)

মুসা (আঃ)

গৌতম বুদ্ধ এবং হিন্দু ধর্ম প্রচার কারী বিভিন্ন ব্যক্তি/ শাষকগণ

উপরোক্ত আলোচ্য ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত বিভিন্ন যুদ্ধগুলোকে অধিকাংশ মানুষই ধর্মযুদ্ধ হিসাবে মেনে নেবেন না। তারপরও সাদা-মাটা ভাবে বলছি উক্ত পাঁচটি ধর্মের মূল ব্যক্তিদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে কত লোক মৃত্যুবরণ করেছিল?

আমি যথার্থ ইতিহাস জানিনা। আপনারা উত্তর খোজার চেষ্টা করুন!

আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের নিকটবর্তী সময়ে সংগঠিত যে কোন একটি যুদ্ধের চেয়েও কম হবে!

ধর্মের বাণী হলো, যে বা যাহারা যৌক্তিক আইনানুযায়ী ব্যতীত কোন একটি মানুষকে হত্যা করল সে বা তাহারা যেন পূর্ণ মানব জাতীকে হত্যা করল! আমরা অবশ্যই একদিন দেখতে পাব ঐসমস্ত ব্যক্তিদের, যাদের কারণে কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়েছে, আমরা দেখতে পাব তাদেরকে মহান আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত বিচার দিনের নির্ধারিত সময়ে, পাপীর কাঠগড়ায় দাড়ানো অবস্থায়।

আজ আমাদের সমাজে কিছু অপরাধ অন্যায় আর কিছু বিকৃত অনাচার অবিচারের চিত্র দেখিছি যাহা বোধ হয় পশুত্বের সংজ্ঞাকেও অতিক্রম করে ফেলেছে। মিথ্যাচার, মিথ্যার মাধ্যমে ব্যবসা, প্রতারনা, দুর্নিতী, হত্যা, অন্যায্য বিষয়াবলিকে মেনে নেয়া, অন্যায় পথ অবলম্বন, যৌন সম্পর্কীয় যাবতীয় অপরাধের প্রাধান্য, নগ্নতার বানিজ্যিকরণ, বাবা কর্তৃক সন্তানকে ধর্ষণ, ভাই কর্তৃক বোনকে যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন, নিকট আত্মীয় যাদের সহিত যৌন সম্পর্ক সমাজ, ধর্ম বিরুদ্ধ তাদের সহিত যৌন কর্ম সম্পাদন, ইত্যাদি।

যৌনতা আর যৌনকেন্দ্রিক আরও কিছু অন্যায় অপকর্ম আমাদেরকে মানুষ হিসেবে চরম লজ্জায় নিক্ষেপ করছে। সমকামিতাকে রাষ্ট্রিয় অনুমোদন, বিকৃত যৌনাচার, মুখ ও পায়ুপথ ব্যবহার, পশুর সহিত যৌন কর্ম করা, নগ্নহয়ে সম্মিলন, নগ্নভাবে আচার-আচার অনুষ্ঠানে যোগদান করা, যৌনতাকে বিজ্ঞান হিসাবে অভিহিত করে এটাকে নিয়ে গবেষনার মাধ্যমে বিকৃত উপস্থাপনে মগ্ন হওয়া! তদপরি মিডিয়া এবং তথ্যধারার মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতা এবং এসবের স্বপক্ষে প্রচার প্রচারণা ধর্মবিরোধী চক্রের একটা কৌশল মাত্র। সাধারণ মানুষের সমাজগুলো এসবের মাধ্যমে জ্ঞান পাচ্ছে, উপলব্ধি করছে, ঘৃণা থাকা স্বত্ত্বেও অনেকে সুরসুরি বশত এসবে জড়িয়ে যাচ্ছে উৎসুক্য ও মজা লাভের আশায়। এমতাবস্থায় নৈতিকতা বিবর্জিত আত্ম-বিধ্বংশী মানুষ নামের দু-পায়ের একটি শ্রেণির উন্মেষ ঘটতে যাচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীতে যারা কোনরূপ ধর্মের অনুশাসন হতে মুক্ত থাকবে।

⏩ বর্তমানে জঙ্গীবাদ, মৌলবাদী মুসলিম জঙ্গী বা আইএস সারা বিশ্বের আলোচ্য বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। কিছু স্বার্থবাদী রাষ্ট্র/ গোষ্ঠীদের স্বার্থেই আজ উক্ত নাম প্রচার করে ধর্মের উপর দায় চাপানো হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী অস্ত্র ব্যবসা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, পুজিবাদী অর্থনীতি, রাজনৈতিক ভাবে রাষ্ট্রগুলোর মাতাব্বরি, আর মিথ্যাচারিতার অদম্য মোহাচ্ছন্নতা, ক্ষমতা পাকা করা, এসবের মূল উদ্দেশ্য।

কে জঙ্গী, কে মানবতাবাদী? জঙ্গীরা কি মানবতা, সভ্যতা বহির্ভূত কাজ করছে নাকি সভ্য রাষ্ট্রগুলো তাদেরকে দমনের নামে মানব সমাজগুলো ধ্বংশ করছে? যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে চিত্রের সঙ্গে বাস্তবতা এবং বক্তব্যের মিল পাওয়া যাচ্ছে না! বিশ্বব্যাপী মুসলিমরাই আজ নির্যাতিত নিষ্পেষিত, মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে তারাই আজ বিশ্বব্যাপী বৈষম্যের শিকার! জঙ্গী নাম দিয়ে তাদেরকে নির্মমভাবে দমন করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী! অপরদিকে অন্যান্য ধর্মের উগ্রবাদী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোকে জঙ্গী/ সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে না! যারা মুসলিমদের বিভিন্ন রাষ্ট্র/ ভূমি থেকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে, নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে এবং কিছু কিছু সম্মানিত রাষ্ট্র আর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদেরকে সহায়তা করছেন যা চরম দুঃখজনক!

কুৎসিত মানুষিকতায় বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট অথবা ক্ষুদ্র জ্ঞানার্জিত কিছু মুসলিমদের কারণেও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাধারণ মুসলিমরা হেনস্থা হচ্ছেন।

অন্যদিকে বিশ্বের নামকরা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রতক্ষ্য পরোক্ষ্য মদদে বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠনগুলো সৃষ্টি হচ্ছে কি না! অথবা যারা জঙ্গী দমন করছেন তারাই জঙ্গীদের সৃষ্টি করে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলছেন কি না! এসব সবই প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়।

প্রকৃত পক্ষে যারা অন্যায় পথে গিয়ে জঙ্গী/ প্রকৃত ধর্মবিরোধী হয়েছে/ সমাজ রাষ্ট্র বিরোধী হয়েছে এবং হবে তাদের স্বরূপ এবং সংজ্ঞা উৎঘাটন করে/ সংজ্ঞা প্রদান করে সাধারণ মানুষদের ঐসব জঙ্গীদের হতে দুরে থাকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে; সুস্পষ্ট ভাবে। এক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলিম, ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান ইত্যাদি কোন ধর্মের মোড়ক দেয়া যাবে না।

চোরাগুপ্তা হামলা, বোমা হামলা, আত্মঘাতী হামলা, জোর করে একটি অঞ্চল দখল নিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোন ধর্মের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়না; রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। নতুন রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। কিন্তু সেই রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা সম্ভব হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান কে করবে? ধর্ম তার আপন প্রতিষ্ঠা অর্জন করে আপন প্রভাবে মানুষের উপর স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধর্মের গভীরতা জীবন-বোধ, মানবিকতা, স্বার্থকতা, মানুষদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে মহান স্রষ্টার স্বীয় অনুগ্রহে। শত টুকরো করে ফেলা হলেও সেই হৃদয় থেকে ধর্মকে পৃথক করা সম্ভব হয় না। এসব আমরা সবাই জানি। যাদেরকে জঙ্গী নামে উল্লেখ করা হয় তারা যেমন ভালো জানেন তেমনি জানেন যারা ইঁদুর বিড়ালের খেলা খেলছেন এবং যারা সুবিধা গ্রহণ করছেন।

এছাড়াও আরও অন্যতম বিষয় হচ্ছে যাদেরকে জঙ্গী হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে তারা সত্যিকার অর্থেই জঙ্গী কি না! অথবা জঙ্গী নাম দিয়ে কেহ/ কাহারা স্বার্থ উদ্ধার করছে কি না!

পৃথিবীতে যত সংঘাত সশস্ত্র সংগ্রাম, নৈরাজ্য অধিকার স্বাধিকার নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অমানবিকতার হাহাকার ধ্বনি মহান আল্লাহকে ক্ষুব্ধ করে পৃথিবীর অন্তিম সময়কে তরান্বিত করছে তার পেছনে করা রয়েছেন, কয়টি রাষ্ট্র, কয়টি সংগঠন ও কতজন ব্যক্তির আঙ্গুলী সঞ্চালন কাজ করছে তাহা বোধ হয় পৃথিবীর অধিকাংশ মুর্খ লোকেরাও জানেন।

আমরা দেখলাম শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো আইএস এর বিরুদ্ধে লড়াই করল। ইরাক, ইরান, সিরিয়া, তুরস্ক, রাশিয়া, সৌদি আরব, ন্যাটো ও যুক্তরাষ্ট্র।

এতগুলো রাষ্ট্রকর্তৃক হামলার পরেও আইএস কিভাবে দীর্ঘ সময় লড়াই করতে সক্ষম হলো? যাদের নিজস্ব রাষ্ট্রকাঠামো নির্মাণ, প্রশাসনিক ও সামরিক শক্তি তৈরির সময়ই দেওয়া হয়নি। যাদের নিজস্ব কোন জল পথ, নেই আকাশ পথ, নিয়ন্ত্রণে নেই কোন বিমান বাহিনী। চতুর্দিকের রাষ্ট্রসমূহ তাদের সহিত বিবাদমান। এমতাবস্থায় আইএস এর উৎপত্তি বৃদ্ধি এবং লড়াই করে দীর্ঘদিন টিকে থাকার রহস্য কোথায়!

মহান আল্লাহর মহান দৃষ্টির সামনেই সব হয়েছে। লাখো মানুষের কান্না, মৃত্যুর নির্মমতা, নিঃশ্বেষ হয়ে যাওয়া মানুষের চক্ষু/অশ্রুগুলো বাদ দিলাম। আফগানিস্তান, ইরাক এবং সিরিয়ায় কার্পেট বোম্বিং এর মতো নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে কত কোটি নিরপরাধ কীটপতঙ্গ, পশু-পাখি তাদের জীবন হারিয়েছে, জীবন শৃংঙ্খল বিপর্যস্থ হয়েছে তার কোন হিসেব কি কাহারো নিকট আছে?

মহান স্রষ্টা সব দেখেছেন, দেখছেন এবং ভবিষ্যতেও দেখবেন! কাহারা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেললো, কোন কোন ব্যক্তি, কোন কোন সংগঠন, কোন কোন ব্যবসায়ী, কোন কোন রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র প্রধানরা তাদের বুদ্ধি দ্বারা অস্ত্র বানিজ্য, স্বার্থের বানিজ্য করলো আর ক্ষমতার দাপট দেখালো! সবই মহান 'আল্লাহ' জানেন।

শতভাগ আস্থায় বিশ্বের মুসলিমরা যে রাষ্ট্রটির নেতৃত্ব শতভাগ মেনে নিত, সেই মহান পবিত্র ভূমির রাষ্ট্রটি আজ নিজের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়ে ইয়ামেনের লাখো লাখো নিরপরাধ মুসলিমদের কাদাচ্ছে! এটা চরম লজ্জাজনক বিষয়!

পৃথিবীর কোন সংস্থা, সংগঠন বা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় একটি প্রাণের সৃষ্টি করা অথচ এরা লাখো কোটি প্রাণের ধ্বংশ করছে এবং ভবিষ্যতেও ধ্বংশ করার পরিকল্পনাতে এগুচ্ছে।

জিনজিয়াং ও মায়ানমারের মুসলমানদেরকে একজন মানুষ হিসাবে বেচে থাকা, স্বাধীন ভাবে বৈধ কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করা, ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মের বিধান পালন করার মতো সাধারন বিষয়াবলিকেও পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না। মায়ানমারের মুসলমানদেরকে বসবাসই করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাদের পূর্ব পুরুষদের ভূমি থেকে বিতারণ ও হত্যা করা হচ্ছে।

ভারতে মুসলমানেরা গরুর গোস্ত খেতে ও বহন করতে পারে না। সারা পৃথিবীর মুসলমানদের হেনস্তা করা হচ্ছে।

এমনকি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও চরমপন্থী বা আইএস/ জঙ্গী নাম দিয়ে তারই মুসলিম ভাই তাকে হত্যা করছে, নির্যাতন করছে!

এ কেমন অবস্থা আমরা দেখছি?

কোন ধর্ম কি এগুলোকে বৈধতা দিয়েছে?

খ্রিষ্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু/ পোপ গণের কেহই বর্তমান খ্রিষ্টান রাষ্ট্র প্রধানদের (যাহারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করে ব্যবসায়ীক স্বার্থে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলেন) কর্মের পক্ষে ধর্মীয় সাফাই দেবেন না অর্থাৎ খ্রিষ্টান ধর্মের সহিত তাদের এহেন কর্মগুলোর মিল নেই।

মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি রাষ্ট্র/ ইসলামের ধারক বাহক হয়েও যুদ্ধ বিগ্রহের স্বপক্ষে ও অন্যান্য যা করছেন তা সম্পূর্ণ (কোরআন হাদিস) ইসলাম সম্মত কিনা আমাদের ভাবতে হবে! জানতে হবে!

মায়ানমার ও চীনের মুসলিমদের বিতারণ ও সংশোধনী নীতি কখনোই বৌদ্ধ ধর্ম সমর্থন করে না।

ভারতে গরু নিয়ে যা হচ্ছে, মুসলিমদের মুখ বন্ধ করে চাপে রাখা হচ্ছে তা কি হিন্দু ধর্মের বক্তব্য?

কাশ্মীর ও অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণ মুসলিমদেরকে যেভাবে দমন পীড়ন ও হেয় করা হচ্ছে তা কি হিন্দুত্ববাদীতা?

কখনোই না! কখনোই না!

এই উপমহাদেশে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই হিসেবে শত শত বৎসর ধরে বসবাস করে আসছেন। বংশগতভাবে মুসলিমরা শাসক হলেও তাদের প্রশাসনের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। ধার্মিক শাসকেরা কখনো হিন্দুদের উপর জুলুম করেননি। ইতিহাস তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করছে। আজ কিছু উগ্রবাদী ব্যক্তি ও সংগঠন ধর্মের নামে নিজেদের স্বার্থে যা করছেন, তা নেহায়েতই ধর্মীয় মুর্খতা এবং অন্যায়। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, রক্ষা করুন।

প্রকৃত অর্থে মানুষ হিসেবে আমাদের প্রয়োজন স্রষ্টার প্রতি বিনীত হয়ে মানুষ হওয়ার, স্মরণ করা দরকার আমিতো যেকোন মুহুর্তে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব; তখন যদি সত্যিকার অর্থেই ধর্মগুলোতে উল্লেখিত জান্নাত বা বাগান বা সুখময় উদ্যান বা সুখের কোন জীবন থাকে অথবা জাহান্নাম বা অগ্নিকুন্ড বা কষ্টকর স্থান

থাকে এমতাবস্থায় যদি পৃথিবীর কর্ম সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসিত হতে হয় তখন আমার পরিণতি কেমন হবে?

দুনিয়ার কুট-কৌশলের খেলা, সম্পদের পাহাড়, আর মিথ্যে অহমিকা পূর্ণ সম্মান দিয়ে, বডিগার্ড দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, আর যাই কিছু করা যাক মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় সত্যিকার বিচারের দিনে মুক্তি পাওয়ার।

আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসিত হওয়া উচিত; এতটা উচিত যতটা উচিত লজ্জা স্থান কে আবৃত করা বরং এর চেয়েও বেশি।

▶▶ সাধারণভাবে আমাদের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা/ পুরুষের প্রধান কর্তব্য হলো ঃ

১. বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করার পূর্বে একজন সঙ্গী নির্বাচিত করা যে হবে চরিত্রবান, নীতি-নৈতিকতার আদর্শিক শিক্ষার অভাব থাকবে না, সৎ, সুন্দর, সরল জীবনাচার এবং সামাজিক সুস্থ পরিচয় যাকে বড় করার পিছনে কাজ করেছে।

২. বংশবিস্তার হলে সন্তানের একটি অর্থবহ যৌক্তিক-সুন্দর নাম রাখা।

৩. সন্তানকে সর্বপ্রথম নীতি-আদর্শ, সৎ জীবনাচার শিক্ষা দেওয়া এবং সমাজ জীবনের প্রতি তার কর্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, মানুষ হিসাবে যেসব কাজ তার কখনোই করা উচিত নয় সে সব জ্ঞান দেওয়া এবং ধর্মের মূল বিষয় গুলো তাকে শিক্ষা দেওয়া জরুরি যে ধর্মেরই অনুসারী সে হোক না কেন।

উপরের তিনটি বিষয় যদি দায়িত্ব হিসাবে মনে করে পিতা-মাতাগণ যথার্থভাবে পালন করতেন তাহলে আমাদের জীবনের বর্তমান চিত্রটি অন্যভাবে দেখা যেত। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো আমরা উক্ত তিনটি দায়িত্বের কোনটাই পূরণ করি না। সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টির পূবেই আমরা বহুগামীতায়/ সেক্স সেক্স খেলায় নিজেদের পুরূষত্ব আর কুমারীত্বকে কলংকিত করে থাকি। এমন হতেই পারে এমন অন্যায় অবিবাহিতদের মধ্যে ঘটতেই পারে!

কিন্তু এটা কিভাবে গ্রহণ যোগ্য হতে পারে যে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে আপনি পাপ মনে করলেন না! অথবা স্বাভাবিক ধরে নিলেন! এর বাহিরেও বিষয় রয়েছে যেমন আমরা আজ বাহ্যিক সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেই, রূপ চর্চার মাধ্যেমে বাহ্যিক

আকৃতিকে সুন্দর করে তার বন্দনা করছি অথচ চরিত্র, জীবনাচার, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে আমরা লক্ষ্যই করি না। অথচ বাহ্যিক সৌন্দর্যে মানুষকে মূল্যায়ন করা, তুলনামুলক প্রাধান্য দেয়া এমন একটি পাপ যার ফলে সরাসরি স্রষ্টাকে অভিযুক্ত করা হয়!

ধর্মীয় জ্ঞান, বিধিবিধান, শিক্ষাগত যত পার্থক্যই আমাদের মধ্যে থাকুক না কেন সত্যিকার অর্থে আমাদের উপরোক্ত তিনটি দায়িত্ব পালন করা জরুরি।

মানুষের মধ্যে নারী; এবং পুরুষ; দুটি শ্রেণী; কিন্তু মানব জাতীর জন্য 'নারী' নামক মানুষের যে শ্রেণীটি রয়েছে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

বিখ্যাত শাষক নেপোলিয়ান বলেছিলেন, আমাকে ভালো একটি মা দাও, শিক্ষিত মা দাও আমি ভালো জাতি উপহার দেব। কেন বলেছিলেন? তিনি কি ধর্মগুরু ছিলেন না কি ধর্ম প্রচারক ছিলেন?

কোনটাই না! আসলে তিনি জানতেন ভালো মানুষ তৈরি করতে হলে ভালো মাতা প্রয়োজন। আর যাই হোক ভালো 'মা' ব্যতীত ভালো সন্তান জন্ম গ্রহণ করে না। ভালো সন্তান ব্যতীত ভালো জাতি পাওয়া সম্ভব না; হওয়া সম্ভব না। যে সন্তানের দ্বারা জীবন জগতের মঙ্গল হয়, মানুষের সত্যিকার কল্যাণ, সত্যিকার উপকার হয়, তেমন সন্তান আর যাই হোক চরিত্রহীন, নীতিজ্ঞানহীন, অশ্লীল 'মাতা'দের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে না। মহান স্রষ্টা শুদ্ধ, পাপ বর্জিত কুলষতা ও কালিমা মুক্ত 'জড়ায়ু'তে যেসব শিশুদেরকে পাঠান তাদের দ্বারা সমাজের, মানব জীবনের, মানব ধর্মের, মানব জাতীর কল্যাণ করে থাকেন।

আমরা যদি লক্ষ্য করি মহা পুরুষদের জীবনের প্রতি, যাদের দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে উন্নতি সাধিত হয়েছে, মানব জীবন জগতের লক্ষ্য উন্মোচিত হয়েছে! সেই সব আবিষ্কারকের, যাদের আবিষ্কারে মানবের কল্যাণ হয়েছে, সেই সব দার্শনিকদের, সেই সব জ্ঞানবানদের, সেই সব গবেষকদের, যাদের দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়েছে!

উক্ত মহাপুরুষদের, মহা-মণষীগণের জীবনের ইতিহাস আমাদের অবশ্যই শিক্ষনীয় বিষয়। অপর দিকে দ্বি-চারিনী, অশুদ্ধ জরায়ু থেকে, সামাজিকতা বর্জিত সম্পর্ক থেকে কখনই ভাল মানুষ জন্ম নিতে পারে না। তবে জন্ম নিতে পারে এমন সব শ্রেণী পেশার সেই সব শিক্ষিত ব্যক্তি যারা তাদের শিক্ষা দ্বারা "অ-মানুষ" হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন! যারা কলমের দ্বারা অনেক কিছু চুরি করেন! সেই

সমস্ত জ্ঞান পাপী যারা জ্ঞানের বিনিময়ে পাপ অর্জন করেন এবং সর্বোপরি সেই সব মানুষেরা জন্ম নিতে পারেন যাদের দ্বারা পৃথিবীতে শয়তানের মঙ্গল সাধিত হতে পারে, শয়তানের অভিলাষ পূর্ণ হতে পারে, প্রচলিত আয়োজিত হতে পারে মানুষকে ধ্বংস করার নানা প্রকার আয়োজন!

এমন কি কুজন্মা, নষ্টা নারীদের সন্তানেরাই তার জন্মদাতা পিতা-মাতাকে হত্যা করার মতো পাপ করতে পারে অথবা পিতা-মাতারাও সন্তানকে হত্যা করতে পারে! এসব কিসের অর্জন জানেন?

নিজেদের কর্মফল মাত্র। অসংখ্য অপকর্ম কুকর্ম আমাদের বর্তমান সভ্যতাকে জুতা নিক্ষেপ করছে। 'ধর্ম' আমাদেরকে ধ্বংস করেনি আশ্রয় দিচ্ছে এখনো। ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে অথবা নাম মাত্র ধর্মের নিশানা বাচিয়ে রেখে আমরা আজ পশুরমত অশ্লীলতা আর নগ্নতার দিকে দৌড়াচ্ছি। যে ঘৃণ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি/ প্রচার করছি তাতে আমাদের স্থান বোধ হয় মলে সৃষ্টি হওয়া কীটের চেয়েও নিম্নে। ধর্মহীনতায় উদভ্রান্ত হয়ে আমরা যতই ধর্মকে গালি দেই না কেন ধর্ম তার আপন মহিমায় উন্মুক্ত রেখেছে দ্বার, যাতে আমরা ফিরে আসি।

আমরা যদি সত্যানুন্ধানী, বিনীত, চরিত্রবান এবং মানবিকতা সংশ্লিষ্ট জীবন বোধ অর্জন করতে পারি তাহলে আমার দ্বারা কল্যাণ সাধিত হবে নিজের এবং সমাজের। বাহ্যিক ভাবে আমি যে ধর্মেরই অনুসরণ করিনা কেন সত্যিকার স্রষ্টা সমীপে সহজে পথ প্রাপ্ত হতে পারব। মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকট সহজ সরল পথ রয়েছে যে সহজ সরল পথ তার নিকট পৌছিয়েছে।

সেই সহজ সরল পথে একমাত্র সহজ সরল নীতিজ্ঞানবান পরোপকারী ব্যক্তিরাই যেতে পারে। কোন মিথ্যাবাদী অসৎ চরিত্রহীন কুটকৌশলী, জ্ঞানপাপী মানুষ স্রষ্টার নির্ধারিত পথে যেতে পারে না; সংশোধিত হয়ে ফিরে আসা ব্যতীত। এটা মহা প্রমাণিত।

বর্তমানে আমাদের মত অসৎ মিথ্যাবাদীরা, সন্তানেরা, আরও অন্ধকারে নিপতিত হচ্ছে যেখান থেকে আলোতে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় হ য ব র ল একটি সমাজ রাষ্ট্র পৃথিবী আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা নিজেরা ধ্বংস হচ্ছি এবং পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করার পথে জন্ম দিচ্ছি এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করছি।

এরা ধর্মের সামান্যই অনুসরণ করবে তদুপরি এরা ধর্মের নাম নিবে, আচার অনুষ্ঠান করবে বিকৃত ভাবে, স্রষ্টাকে ডাকবে উল্টো/ অযোচিত/ অপ্রাসঙ্গিক/ মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। এরা ধর্মকে গালী দিবে, পূর্ব পুরুষদেরকে ঘৃণা করবে, নিজেদেরকে জ্ঞানী ভাববে, অসভ্যতাকে সভ্যতা মনে করবে, অশ্লীল যৌনতায় মেতে উঠবে প্রকাশ্যে, পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে যাবে, পরিবারে শান্তি থাকবে না, আত্মীয়তা থাকবে না, যৌনতাই জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাড়াবে, যৌনতা মানুষের জীবনকে পরিচালিত করবে। মানুষ পশুর মত সঙ্গমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে, সত্য কথা বলবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে, কথায় কথায় সবল দূর্বলকে হত্যা করবে, নিজে ভোগ করার জন্য অন্যের উপর অত্যাচার করবে। দেখুনতো, সভ্য জগতে সমকামিতায় লিপ্ত হয় যারা এবং যারা একে বৈধতা দেয় যারা তারা কি রূপে সভ্য এবং সভ্য রাষ্ট্র হতে পারে!

যৌনতা একটি গোপন বিষয় হওয়া সত্ত্বেও যৌনতা নির্ভর বানিজ্য যখন ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন মানুষের নীতি নৈতিকতা কোথায় থাকে?

অবাধ যৌন কর্মকে যখন পাপ হিসেবে দেখা না হয় তখন 'লজ্জা' কোথায় মাথা ঠুকে?

নারী এবং পুরুষ যখন বিপরীত সঙ্গীকে বাদ দিয়ে সেক্স-টয় বা অন্যান্য উপকরণ দ্বারা যৌন চাহিদা নিবৃত করার সংস্কৃতিতে অগ্রসর হয় আর রাষ্ট্র সমাজ ও কথিত ধর্মগুলো দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন এর সূদুর প্রসারী ফলাফল কেমন হতে পারে তা কি আমরা ভাববো না?

মহান সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ' যেন আমাদেরকে এবং পাঠককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন!

▶▶ পৃথিবীর সমাজগুলো ধ্বংসাত্বক পরিণতি আহ্বানের এসব প্রতিযোগীতার মধ্য হতে মুক্ত থাকার জন্য মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকট বিনীত হয়ে তার নিকটি পথ প্রার্থনা, মঙ্গল কামনা করা, সর্বাধিক সংগত সঠিক এবং একমাত্র পথ বলে আমি মনে করি। কারণ তিনি মহান স্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা, অন্তরের বিষয়াদী তিনি জানেন, তিনি অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সবই জানেন এবং সর্বোপরি এই পৃথিবীতে তিনি মানুষকে সাময়িক অবস্থানকারী হিসাবে সৃষ্টি করে পরীক্ষা করছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির মাধ্যমে। তিনি পরীক্ষা করছেন কে তার প্রতি অবনত হয়, তাকে আহ্বান করে এবং কে শয়তানের অনুগত হয়।

একজন মানুষ হিসেবে যদি আমরা শরীরের বিভিন্ন প্রকার লোম কাটার জ্ঞান রাখতে পারি, একজন মানুষ হিসেবে যদি যৌন জীবন সম্পর্কে ন্যূনতম উত্তেজনার খোজ রাখতে পারি, খাবার খেয়ে পেট ভরার মত জ্ঞান রাখতে পারি, ন্যূনতম এই বোধ গুলো যদি আমাদের থাকে এবং এর বিপরীতে, মহান স্রষ্টার একজন সৃষ্টি হিসাবে তার নিকট সঠিক এবং সত্যিকার মুক্তির পথ কামনায় বিনীত হওয়ার সামান্য সময়, সামান্য আবেগ অনুভূতি এবং মানষিকতা যদি না থাকে তাহলে আমার মানুষ হিসাবে জন্ম নেওয়াটাই বৃথা এবং সত্যিকার অর্থে আমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি- 'মানুষ' হতে পারিনি, চতুষ্পদ প্রাণি/ প্রাণিসম ব্যতীত।

যদিও আমি নিজেকে মানুষ হিসেবে দাবি করি বা মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। পৃথিবীতে এসে আপন পালন কর্তার নিকট প্রার্থনা না করার, স্মরণ না করার, নিজ ক্ষুদ্রতায় অসহায়ত্ব প্রকাশ না করার ফলে যদি আমার মানব জীবনটি মহান স্রষ্টার সৃষ্টিগত ইচ্ছার বিরোধী হয় তাহলে আমাদের ভাবা উচিত আমি যখন এই পৃথিবী ত্যাগ করে আমার মহান পালনকর্তার নিকট প্রত্যাবর্তন করব তখন তার ক্রোধ থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে!

কেউ আছে কি! রক্ষা করার মত?

জীবন-মৃত্যু, দেহ-আত্মা

আমরা প্রতিটি মানুষ (অধিকাংশই) আজ আত্মভোলা/ বিস্মৃত-পরায়ণ পাগলের মতো দিন কাটাচ্ছি। আমরা সর্বদা ব্যস্ত আছি কিভাবে জীবন কাটিয়ে বেচে থাকা যায়, কিভাবে সুখ পাওয়া যায়, কিভাবে ভোগের মাধ্যমে পরিপুর্ণ জীবনটাকে সুখের মাধ্যমে অতিবাহিত করা সম্ভব হয়! অথচ আমরা যে কোন সময় এই পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যেতে পারি। আমাদের পৃথিবীতে আসার সময় সম্পর্কে ধারনা পাওয়া সম্ভব কিন্তু পৃথিবী ত্যাগ করার সময়ের কোন জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। যদি পৃথিবীতে বসবাস করার নিশ্চয়তা থাকত বা ন্যূনতম পৃথিবী ত্যাগ করার সময় সম্পর্কে ধারনা, জ্ঞানটুকুও থাকত তাহলে পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ সেই চেষ্টা করত বা যে কর্ম করলে না যেতে হয় পৃথিবী ত্যাগ করতে না হয় এবং এ জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো।

মহান 'আল্লাহ' আমাদেরকে পৃথিবী থেকে মৃত্যুর মাধ্যমে উঠিয়ে নেন এবং সমস্ত প্রাণিদেরকেও মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবীর জীবনের ইতি ঘটান! পৃথিবীতে আসা যাওয়ার মহা আয়োজন চলছে প্রতিনিয়ত। পৃথিবীতে আসা এবং যাওয়ার প্রতিটি মুহুর্তের মাঝেই আমরা আমাদের জীবনকে সাজিয়েছি, উপভোগ করছি এবং উপভোগের লক্ষ্যেই সমস্ত জ্ঞান ও শ্রমকে নিয়োজিত করেছি; অনেকটা পথচারির মতোই আমাদের মানব জীবনে! কেন এত ক্ষুদ্রতা ও স্বল্পতা?

আমরা প্রশ্ন করব কাকে এবং জবাব পাওয়া বা না পাওয়াতেই বা কি লাভ আছে!

পৃথিবীতে প্রচারিত প্রতিটি ধর্মেই মানুষের জীবনকে ক্ষনস্থায়ী এবং পথিকের যাত্রাপথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তুলনা করা হয়েছে সল্প সময়ের অবস্থান কাল/ স্বল্প সময়ের পরীক্ষা কাল/ স্বল্প সময়ের ফসল উৎপন্ন করার সময় হিসাবে। মানুষের জীবন এবং পৃথিবী নিয়ে প্রতিটি ধর্মের এসব উদাহরনের সারমর্মগত বিষয়ে কোন প্রকার বিরোধ নেই।

আমরা মানুষেরা আজ সাধারণ প্রাণিদের মতো জীবন অতিবাহিত করছি, তারা যেমন নির্বোধ আমরাও অন্তঃকরণ বিবেক বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও অন্ধত্ব ও নির্বুদ্ধিতা বরণ করে নিয়েছি। আমরা মানুষেরা দৈহিক ও জৈবিক কিছু বিষয়ে অন্যান্য সকল প্রাণিদের মতো হলেও অন্তঃকরণ এবং মানবীয় বিচার বুদ্ধি থাকার কারণে সব প্রাণিদের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি; অনেক ক্ষেত্রে তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব

প্রমাণ করছি আবার কিছু ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব বিসর্জন দিয়ে তাদের সহিতই মিশে যাচ্ছি। পশু পাখিরা যে ভাবে পৃথিবীতে আহার সংগ্রহ করে এবং সন্তান/ বাচ্চা জন্মদান করে এবং মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের জীবনে যেমন কোন উদ্দেশ্য থাকে না, উদর পূর্তি করা, যৌন কর্ম করা, মল ত্যাগ করা, বাচ্চা প্রতিপালন করা এবং সাময়িক আবাস সৃষ্টি করা ব্যতীত অন্য কোন কাজ তাদের নেই এবং জীবনের অন্যকোন উদ্দেশ্য বা মর্ম তাদের থাকে না। পশু-পাখিরা তাদের এসব প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় প্রতি মুহূর্তে।

অথচ, আজ আমরা মানুষেরা, সেই একই পথ অবলম্বন করে চলেছি। যদিও বিবেক বুদ্ধি থাকার কারণে আমরা আধুনিকতা, বিজ্ঞান এবং নানা প্রকার উৎকৃষ্ট উপকরণ ও ভাবনায় জীবনকে সাজিয়েছি।

মানুষ সাধারণ প্রানীদের মত/ পশুর মত খায়না, পশুর মত স্থানে খায়না, মানুষ পশুর মত বসবাস করে না, পশুর মত মলমূত্র ত্যাগ করে না, পশুর মত বিপরীত লিঙ্গের সহিত যৌন কর্মে লিপ্ত হয় না।

তবে অধিকাংশ মানুষ পশু পাখির মতই লক্ষ্যহীন পথে জীবনকে নিঃশ্বেষ করে পৃথিবী ত্যাগ করে। মানুষেরা তাদের উৎকৃষ্ট জীবনে বিভিন্ন রকম উপাদেয় সু-স্বাদু খাবার তৈরী করে উদর পূর্তি করে। প্রতিটি মানুষেরা তাদের উৎকৃষ্ট জীবনাদর্শে নিজ নিজ সক্ষমতা দ্বারা উন্নত সমাজ জীবনে বসবাস গৃহ তৈরী করে তাতে বসবাস করে। বর্তমান মানুষেরা তাদের জীবনকে যে ভাবে সাজিয়েছে ইতঃপূর্বে কেউ এরকম উৎকৃষ্টতর জীবনে প্রবেশ করেনি। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পশু-পাখিদেরকে বিবেক বুদ্ধি দেননি তাই তারা প্রাকৃতিক পরিবেশেই বসবাস করে, তাদের কোন বাড়ি ঘর থাকে না। কোন রকমে রাত কাটানো বা বাচ্চা প্রসব করার জন্য ক্ষুদ্র বাসা তৈরী করে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে।

▶▶ মানুষেরা তাদের বসবাস গৃহকে এত উন্নত এবং উৎকৃষ্টতার শৈল্পিক শিখরে নিয়ে গেছেন যার কোন প্রকার তুলনা দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষ যেমন বহুতল বিশিষ্ট প্রাসাদ তৈরীতে লিপ্ত হয়েছে তেমনি বহুতল বিশিষ্ট প্রাসাদকে নানা প্রকার ভোগ সম্ভার এবং সৌন্দর্যের সামগ্রী দিয়ে সাজিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ, বড় এবং সুখী, সফল মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। এবং এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়াকেই প্রকৃত জীবন হিসেবে মনে করছে।

এসব লোকের পাশাপাশি অসংখ্য মানুষ আছেন যারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছেন কোন রকমে উদরপূর্তি করা, রাত্রি কাটানো এবং ন্যূনতম বসবাস গৃহের স্বপ্নই যাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

পৃথিবীতে ভোগবাদী সমাজের মানুষগুলোর অবস্থা এমন বিলাস বহুল যে তাদের মলত্যাগ করার স্থান তৈরিতে যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেই অর্থ দিয়ে সাধারণ মানুষেদের এক বা একাধিক বাড়ির ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো। বসবাসের অন্যান্য উপকরণের পিছনেও লাখো লাখো টাকা/ ডলার ব্যয় করছেন। আধুনিক জ্ঞানবান সভ্য লোকদের একাংশ আজ সোনা-রুপা দিয়ে বানানো মলপাত্র তৈরী করে তা ব্যবহার করছেন এবং উপহার হিসাবে অন্যকে প্রদান করছেন। বিভিন্ন রকম উৎসব আয়োজনে কোটি কোটি টাকা/ ডলার ব্যয় করছেন। নিজের ক্ষমতা, সামর্থ জাহির করছেন। অন্যদিকে শত শত কোটি মানুষ শুধু মাত্র তিন/ দুই বেলা খাবার যোগাতে/ সংগ্রহ করতে কি পরিমাণ কষ্ট করছেন তা আমরা সবাই জানি।

পৃথিবীতে কোটি কোটি নারী আছেন যারা ০১ (এক) গ্রামের পরিমাণ অংশ সোনা ব্যবহার করার সাধও পূরণ করতে পারছেন না যদিও নারীদের অলঙ্কার হিসেবে সোনা অপরিহার্য্য। এসব বিষয় সত্যিই দুঃখজনক!

মানুষদের আর্থিক ক্ষমতা/ ক্রয় ক্ষমতা থাকলেও ভোগ করা, ব্যবহার করা বা একজন মানুষের শরীর দ্বারা প্রত্যাশিত বস্তুর ব্যবহার/ প্রয়োগ ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। কারণ মানব শরীর আর আত্মার মিশ্রনে যে দেহ তা কখনোই পরিপূর্ণ বস্তুর ন্যায় ব্যবহার যোগ্য হয় না। আপন শরীর দ্বারা সকল প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব হয় না। বিষয়টিতে মহা-রহস্য রয়েছে যা স্রষ্টার সুক্ষ্ম নির্দেশনা বহন করে।

হাজারো প্রকার উপাদেয় খাবার সুসজ্জিত থাকলে আর সকল কিছু খাওয়ার আত্মিক ইচ্ছা থাকলেও সর্বোচ্চ ২৫০ হতে ৫০০ গ্রামের বেশি একজন মানুষের পক্ষে একবারে খাওয়া সম্ভব হয় না। কাহারো প্রতিদিনের উপার্জন এক কোটি টাকা হলেও সত্যিকার অর্থে একজন মানুষের দৈনিক খাবারের পিছনে সর্বোচ্চ ৫০০ হতে ১০০০ টাকা ব্যয় হতে পারে। এর বাইরে স্থান কালের অবস্থান ভেদে আমরা মানুষদের যে বৃহৎ ব্যয়-সম্ভার দেখি তাহা মূলত অহংকার আত্মম্ভরিতা আর ক্ষমতা প্রদর্শনে অপচয় করা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

বসবাসের ১০০টি বাড়ি থাকলেও একজন মানুষের প্রয়োজন দুই/ তিনটি কক্ষসহ একটি খাট মাত্র! তারপরও সেই খাটটির একটি অংশ ফাঁকা থাকলে সুখের ঘুম আসতে চায় না নানাবিধ কারনে।

হাজারো গাড়ি থাকলেও আপনার দ্বারা যথার্থ ব্যবহার হয় একটি গাড়ির একটি সিট মাত্র। সুদর্শন অসংখ্য সঙ্গীর সহচর্য থাকলেও তাদের দ্বারা মনের সুখ/ সখ পূরণে সুখী হওয়ার ইচ্ছা পূরণ সকলের দ্বারা (অধিকাংশ মানুষেরই) হয় না।

আমরা সুদর্শন মানুষেরা নিজেকে/ বিপরীত সঙ্গীকে নানাভাবে ঘরে-বাহিরে প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছি আর হাজারো দর্শক মানুষদের নানা রকম আকাঙ্খা চাহিদা সৃষ্টি করছি, যৌন সূরসূরি জাগ্রত করছি ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অথবা অজ্ঞানতায়। অথচ আমরা প্রদর্শনকারী সু-সজ্জিত সুন্দর মানুষেরা, যারা নিজেদেরকে সুন্দর এবং প্রতিষ্ঠিত ভাবি তারা অধিকাংশই পারিবারিক, ব্যক্তি, এমনকি যৌন জীবনেও পুরোপুরি সুখী হতে পরি নি; অসংখ্য প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কারনে! মনোমালিন্য, কলহ, বিবাদ, মারামারি ইত্যাদি লেগেই থাকে। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বিষয় হলো, দু'জন দুপাশ হয়ে পৃথক/ একই বিছানায় ঘুমাতে যাই। অথচ আমাদেরকে দেখে দর্শক মানুষদের অনেকেই সুখী ভাবে এবং আমাদের জীবন গতি প্রবাহ অনুসরণ করে নিজেরা সুখী হতে চায়। কিছু কিছু নিঃসঙ্গ মানুষ আমাদের কাহারো অতি প্রদর্শিত শরীর কল্পনা করে রাত্রে ঘুমোতে গিয়ে এমন কিছু ভাবেন আর করেন যা বলা সম্ভব নয়। তবে আমরা কিছুটা হলেও এ জন্য দায়ী!

দরিদ্র/ সাধারণ ব্যক্তি তার অতি সাধারণ জীবনে আপন সঙ্গীকে সুখী করে নিজে সুখী হয়/ জীবন কাটায়/ মহাতৃপ্তির নিদ্রায় যেতে পারে কিন্তু সেসব সুন্দর সফল অতি আধুনিক মানুষেরা যাদের দিকে সমাজ রাষ্ট্র মিডিয়াগুলো তাকিয়ে থাকে, তারা নিজে এবং বিপরীত সঙ্গীকে তৃপ্ত নাও করতে পারে। শান্তি সুখের বদলে অনেক মানুষেরা নিজেরা দাম্পত্য কলহ, ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে, বিনিদ্র রজনী কাটায়, মদ্যপান করে, অনৈতিক পথে অগ্রসর হয় এবং পরিশেষে পৃথিবীর জীবনটাকে অসহ্য অসহনীয় মনে করেন। অনেকে আত্মহত্যায় মুক্তি খোজার চেষ্টা করেন!

আমরা মানুষেরা পৃথিবীর মানুষদের বাহ্যিক অবস্থাসমূহ/ চিত্রগুলো দেখে একে অন্যকে সুখী সফল সার্থক জীবনের অধিকারী বলে মনে করি এবং নিজেরা তাদের মত সুখী সফল জীবনের প্রত্যাশা করি।

পৃথিবীর মানুষেরা আজ একে অপরের সম্পর্কে "মনে করা"/ "ধারণা করা" (সুখী) জীবনের প্রত্যাশায় নিজেদের প্রত্যাশী হিসেবে প্রস্তুত করার নিমিত্তে এবং প্রস্তুত করার পথে অগ্রসর হয়; তাদের পুরো জীবনটি ব্যয় করার মাধ্যমে।

আমরা অনেক কিছুই ভাবিনা অথচ যা কিছু ভাবা উচিত!

সুস্বাদু গরুর গোস্তের একটি টুকরো কাহারো জন্য ডাক্তার হারাম/ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন অথচ একটি গরু কিনে একসঙ্গে রান্না করার ক্ষমতা তাহার রয়েছে। অপরদিকে মাসে এককেজি গরুর গোস্ত কেনা সম্ভব হয়না এমন কোটি কোটি মানুষেরা রয়েছেন কিন্তু তাদের একজনের শরীর দ্বারা একবারে ৫০০গ্রাম গোস্ত হজম করা সম্ভব এবং তাদের জন্য ক্ষতিকরও নহে। এটি একটি উদাহরণ মাত্র।

কারো ভোগ করার সামর্থ্য আছে কিন্তু ক্রয় ক্ষমতা নেই,তারা ক্ষুধার্ত দিবা-রাত্রি কাটাচ্ছেন আর অসহায়ভাবে অর্থপতি ক্ষমতাবানদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কাহারো ক্রয় ক্ষমতা আছে ভোগ করার ইচ্ছা থাকলেও সাধ্য/ সক্ষমতা নেই, তারা ভূল পথে সুখী হওয়ার মানষে অপচয় করছেন, হুল্লোর করে মজা নিতে চাচ্ছেন! অন্যদের দেখিয়ে বৃথা তৃপ্তি পাচ্ছেন।

এসব হলো পৃথিবীস্থিত মানুষদের চিত্রসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র।

পৃথিবীতে সম্পদের বৈষম্য আজ কোন স্তরে গিয়ে ঠেকেছে আর কোথায় যাবে, 'আল্লাহ' ভাল জানেন! মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেনী-বৈষম্য, অর্থনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতা মানব সমাজ আর মনুষ্যত্ব-বোধকে খন্ড খন্ড করে ফেলেছে। সভ্য অসভ্য ধনী দরিদ্র সম্মানিত অসম্মানিত ইত্যাদি নানান বৈশিষ্ট্যের উপলক্ষ্য আজ টাকা/ রূপী/ ডলার/ অন্য কোন বিনিময় মাধ্যম।

আশ্চর্য জনক সত্য এবং সাদৃশ্যের কথা বলবো?

মানুষ আর পশুরা যখন মলমূত্র ত্যাগ করে যেখানেই করুক, প্রাসাদে করুক অথবা খোলা জঙ্গলে করুক, মহা-আকাশে করুক আর ভাঙ্গা বস্তিতে করুক, মানুষ আর প্রাণির মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করার সময়ে কোন প্রকার পার্থক্য কি থাকে?

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণিরা যখন যৌন কর্মে লিপ্ত হয় যেখানেই হোক, বিলাস বহুল তারকা বিশিষ্ট হোটেল হোক অথবা ভাঙ্গা কুড়ে ঘরে হোক এহেন কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সময় কি মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য থাকে? আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব আমরা সাধারণ/ দরিদ্র মানুষেরা বা

অন্যান্য প্রাণিগুলো যেমন চোখ মুখ লাল করে ফেলি, প্রয়োজন পূরন করার চেষ্টায় অবর্তীন হই, ঠিক তেমনি আমাদের পৃথিবীর প্রতাপশালী শাসকগণ থেকে শুরু করে বিলিয়নার, মিলিয়নার ডলারের মালিক এবং সভ্য মানুষদের চোখ মুখ গুলো লাল হয়ে যায় জরুরি প্রয়োজন পূর্ণ করার সময়। কোন পার্থক্য থাকে না।

আপনি একটু ভেবে দেখুনতো, কোন ধার্মিক/ অধার্মিক কোন ব্যক্তি, যোদ্ধাবাজ কমান্ডার, কোন ক্ষমতাধর শাসক, কোন সমাজপতি আর অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিরা যখন যৌন কর্মে লিপ্ত হন তখন কোথায় থাকে ব্যক্তিত্ব, কোথায় থাকে তার ক্ষমতা, কোথায় থাকে তার জীবনের এত অর্জন?

চরম যৌনতার আনন্দ/ যৌন কর্মের মগ্নতা/ যৌনতার দূর্বার পীড়নে, দংশনে তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্টতা হারিয়ে যায় বীর্যপাত বা চরমানন্দ লাভের সময় পর্যন্ত। আর এই সময়টুকুর মধ্যেই সকল মানুষেরা সাধারণ প্রাণিদের কাতারে এসে দাড়ায়। আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি?

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণিরা যখন ঘুমায় তখন তাদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্যই থাকেনা! পতাপশালী ক্ষমতাধর, শাসক, হিংস্র ইত্যাদি, অথবা নানা গুনবাচক গুনে গুনান্বিত কোন ব্যক্তি (যাকে পৃথিবীতে সম্মান করা হয়, ভয় করা হয়, ক্ষমতাধর মনে করা হয়) যখন ঘুমে আক্রান্ত হন তখন কতটা অসহায় বোধ করেন এবং ঘুমানো অবস্থায় তিনি কতটা ব্যক্তিত্বহীন হয়ে যান এবং উপরোক্ত গুনাবলী গুলো (যার দ্বারা আমরা তাকে ভয় করি সম্মান করি) সবই উধাও হয়ে কোথায় একীভুত হয়! আমরা অনুধাবন করি না!

সৃষ্টিগত কারণে সকল মানুষেরা এবং পশু-পাখিরা দরিদ্র-ধনী, সবল-দুর্বল সবাই এই জৈবিক প্রয়োজন গুলো পূর্ণ করার সময় একই কাতারে এসে যায়। প্রকৃত অর্থে মানুষদের মধ্যে কর্মগত/অর্জনগত কারনে বৈশিষ্ট্য বা ভেদাভেদ থাকতে পারে কিন্তু 'মানুষ' হিসেবে, আত্মিক হিসেবে কোন ব্যাপক দুরত্ব বৈষম্য এবং বিশাল ব্যবধান থাকবে না; যেমনটা আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে আমরা দেখছি! কিন্তু আমরা এগুলো ভাবিনা কখনোই।

পশু পাখিরা মৃত্যু বরণ করলে অন্য পশু-পাখিরা খেয়ে ফেলে বা পচে যায় এবং মানুষেরা খায়। মানুষের মৃত্যুর পরও খেয়ে ফেলা হতো কিন্তু মানুষ তাদের মৃতদের সংরক্ষণ করে পশু-পাখি হতে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে উৎখাত করে ভূ-গর্ভের কোথাও তাদের দৃষ্টিতে আড়াল করে রাখে।

কিন্তু তাদের প্রিয় স্বজনদের, শাসকদের, ক্ষমতাবানদের, সম্মানিতদের, নিজেদের অর্জিত বুদ্ধি মেধা/বিজ্ঞান দ্বারা পচন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। মূল কথা হলো মৃতব্যক্তিকে রক্ষা করার কোন প্রকার প্রয়োজনীয়তা মনে করা হয় না বা এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ মানুষের দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে গেলে সেই দেহটির কোন মূল্যই থাকে না। অথচ পশু-পাখিদের দেহ থেকে প্রাণটি বেড়িয়ে গেলে তা মূল্যবানে পরিণত হয়। কারণ আমরা পশু-পাখিদের দেহ থেকে প্রাণ বের করার জন্য চেষ্টা করি এবং লালায়িত থাকি।

আমরা বুঝি কিন্তু বোঝার বিষয়টি নিয়ে ভাবিনা, কিছু সময় ব্যয় করে বিষয়টির অন্তস্থলে প্রবেশ এবং সেই অনুযায়ী করণীয় স্থির করি না। এটাই হলো মুল সমস্যা!

পৃথিবীতে মানুষ ব্যতীত যে সমস্ত প্রাণি সকল আছে তাদের দেহগুলো নিয়ে আমরা আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করছি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে। এমন কি লক্ষ কোটি ডলার দিয়েও কোন কোন প্রাণিকে কিনে নিচ্ছি, গর্ব অনুভব করছি এবং আমাদের মানুষদের মূল্যবান প্রাণের দ্বারা পৃথিবীর জীবনকে প্রাণবন্ত অর্থবহ সম্মানীত করার চেষ্টা করছি আমাদের ভাবনায়।

মূল বিষয় হচ্ছে যে, সাধারণ প্রানি/ পশু-পাখির প্রাণের মূল্য নেই দেহের মূল্য আছে। মানুষের প্রাণের মূল্য আছে দেহের মূল্য নেই।

সমস্ত প্রাণিরা যে প্রক্রিয়ায় আসে মানুষেরাও সেই প্রক্রিয়ায় আসে এবং পৃথিবী ত্যাগ করে। মানুষ এবং পশু-পাখি এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য পৃথিবীতে কিছু সময়ে, কিছু কারণে। এই সময়ে মানুষেরা তাদের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে শ্রেষ্ঠভাবে জীবন কাটায় এবং অন্যান্য প্রাণিদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে। আর প্রাণিরা নিরীহভাবেই জীবন অতিবাহিত করে পৃথিবী ত্যাগ করে।

এক্ষেত্রে মানুষের জন্য তার সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহতায়ালার) নির্দেশিত পথ হলো প্রাণিদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব কায়েমের পাশাপাশি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা প্রাণিদের সহিত স্রষ্টা প্রদত্ত প্রকৃতিগত ব্যাপক পার্থক্য সূচীত কর্মের মাধ্যমে স্রষ্টার আনুগত্য করা!

▶▶ মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করে সুখভোগ করার ইচ্ছায় সচেষ্ট হয় অথবা অনেকে মোটা মোটি ভাবে স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে জীবন কাটাতে চায়। অধিকাংশ মানুষই শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ মর্যাদাকর জীবন লাভের চেষ্টায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। মর্যাদাকর জীবনের জন্য অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনগুলো পূর্ণ

করার জন্য মানুষের অতীব দরকার হয় সম্পদ সামগ্রীর। সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যেহেতু বিনিময় যোগ্য নয় সেহেতু প্রয়োজন হয় টাকা/ ডলার/ রুপি অথবা অন্যকোন বিনিময় মাধ্যমের। এমতাবস্থায় মানুষ দৌড়াতে শুরু করে টাকার পিছনে। টাকা উপার্জনে মুখোমুখি হয় তীব্র প্রতিযোগীতার। টাকা উপার্জন করতে হলে নানা প্রকার পথে প্রতিযোগীতার মাধ্যমেই তবে উপার্জন করতে হয়। এই পথগুলো অবলম্বন করতে চাইলে প্রয়োজন হয় সেই পথে চলার শিক্ষা, জ্ঞান, পথ নির্দেশিকা, পরিচিতি ইত্যাদির। প্রয়োজন পূরণ করার এই মাধ্যমগুলি আয়ত্ব করার জন্য প্রয়োজন হয় সময়ের। এবং একে দীর্ঘ-সূত্রিতার মাধ্যমে ধাপে ধাপে অর্জন করতে হয় আপ্রাণ 'চেষ্টা'র ফলে। এই চেষ্টার মাধ্যমেই মানুষেরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়। বলা যায়, মানুষেরা শিশুকাল থেকে এই 'চেষ্টা' নামের নানা রকম ধাপ গুলোতে অংশ গ্রহণ করে অগ্রসর হতে থাকে শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণ সম্মানিত জীবনের স্বপ্নে!

পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তারা অর্জনগুলো নিয়ে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয় প্রতিষ্ঠার জন্য। অনেকে ছিটকে পড়ে ব্যর্থ হয়, কেহ অকালে মৃত্যু বরণ করে, কেহ নানা প্রকার দূর্ঘটনায়/ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে, অসহায়ত্ব বরণ করে অথবা মৃত্যু বরণ করেন। মানুষদের একটা অংশ সামান্য, আংশিক বা মোটামুটি সফল হয়, কেহ ভালো ভাগ্যের কল্যাণে ব্যাপক সফলতর জীবনের দেখা পায়। আমরা এরকম সফল ব্যক্তিদের আলোচনা করে থাকি এবং তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। তারা শিরোনাম হয় জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যু বরণ করার পরও।

পৃথিবীতে কিছু সামান্য মানুষ আছেন যাহারা সচেষ্ট হন শুধুমাত্র কোন রকমে জীবন পাড়ি দিতে। তাহারা প্রাচুর্য্যপূর্ণ জীবন, বিশাল বাড়ী, বাগান, ভোগবাদী জীবনের নানান চিত্রে আকর্ষিত হন না। এরা অধিক অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে নীতি, জ্ঞান, ধর্ম বিসর্জন দেন না। সাদামাটা জীবন অতিবাহীত করে মহান স্রষ্টার সমীপে বিনীত জীবন যাপন করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। মৃত্যুর ভাবনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে এবং পৃথিবীর পরবর্তী জীবনে আত্মার একাকীত্ব এবং পরিণতি সম্পর্কে তার সচেতন। তারা ধর্মীয় ভাবনায় জীবনটাকে সংযত রাখেন। এসমস্ত লোকদের দ্বারা সমাজ সংসারের কোন রূপ ক্ষতি সাধিত হয় না। মানবিকতার মহান নির্দশন তাদের দ্বারাই প্রচারিত হয়। সমাজ সংসারে এসমস্ত ব্যক্তিগণ আপাত দৃষ্টিতে, ভোগবাদীদের দৃষ্টিতে, মূল্যহীন প্রতীয়মান হন (মনে হয়) কিন্তু তারা অতি সাধারণ জীবন যাপনের মাধ্যমে সমাজের অন্যতম অংশ বা ভিত্তি হিসাবে গণ্য হন।

যে সমস্ত ব্যক্তিরা পার্থিব জীবনের সফলতা অর্জন, অধিক অর্থ-উপার্জন, চাকচিক্যময় ভোগবাদী জীবনের প্রত্যাশা করে জীবনের মূল্যবান সময়কে সেই পথে ব্যয় করে শ্রম স্বীকার করতে থাকে বিনিময়ে যা অর্জিত হয় তাতে আমরা তাদেরকে জীবন কাটাতে দেখি। এমতাবস্থায় তারা তাদের সম্পূর্ণ বোধ শক্তি এবং শ্রম শক্তিকে ভোগের পিছনে, স্থাবর/ স্থবির পৃথিবীয় অর্জনের পিছনে ব্যয় করে পৃথিবী ত্যাগ করেন।

▶▶ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আমাদেরকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন?

অন্যান্য প্রাণিদের মতো মরে যাওয়াই যদি মূল বিষয় হতো, আমাদের কোন প্রকার জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে না হয়, তাহলে তিনি আমাদের-মানুষদেরকে, প্রাণি সমাজ এবং পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রভূত্ব করার ক্ষমতা দিলেন কেন?

কেন মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়োজনে পৃথিবীর যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে?

পৃথিবীতে বসবাস করে পেট পূর্ণ করা, যৌন কর্ম করা এবং নিদ্রা যাওয়াই যদি জীবনের সারমর্ম হয়ে উঠে বা আমাদের মত মানুষদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠে তাহলে আমার আর পশুর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির এত তফাত কেন করা হলো?

দূর্ভোগ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির! ধ্বংস আমাদের পিছনে ধাওয়া করছে কারণ আমরা আমাদের জীবনকে শুধু প্রানিত্ব কেন্দ্রিক পেট নির্ভর এবং যৌনতা কেন্দ্রিক মূল উপজীব্য করে তোলেছি! মানুষ কেন প্রাণি সমাজের উপর প্রভূত্ব কায়েম করতে পেরেছে! এসব কি ভাবা উচিত নয়?

এত সুন্দর ভাবে ভালো মন্দ বুঝার ক্ষমতা এবং উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি, এত সম্মানবোধ, ব্যক্তিত্ববোধ কেন মানুষকে দেওয়া হলো? লজ্জা পরিস্ফুটিত এবং এর জন্য পোষাকের ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে?

প্রাণিদের মতো মানুষেরা তাদের যৌনাঙ্গ এবং অন্যান্য অঙ্গ উন্মুক্ত রাখে না কারণ তাকে তার ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, এবং সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের লক্ষ্যে মহান স্রষ্টা তার জন্য 'লজ্জা' সৃষ্টি করে দিয়েছেন। লজ্জা নামক বিষয়টি সাধারণ কোন প্রানিকে দেওয়া হয়নি! কিন্তু কেন? আমাদের ভাবতে হবে।

মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান আনন্দপূর্ণ স্বার্থক সফল কাজ হলো তার বিপরীত লিঙ্গের সহিত যৌন কর্ম সম্পাদিত করা। ভাবুনতো, মানুষ কত সুন্দর ভাবে এই কাজে লিপ্ত হয়! এত আনন্দ উল্লাস আর উচ্ছাসের প্রকাশ পায় যার তুলনা অন্য কোন কিছু দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

অথচ প্রাণিরা! কি অপরাধ করিছিল তারা? এহেন কর্মে নিযুক্ত হতে অথবা সঙ্গীর খোজ অথবা সময়, সুযোগ ইত্যাদির সম্মিলন হয়ে উঠেনা প্রায়ই। অনেকে জীবনে একবারের জন্যও তীব্র আকাঙ্খা সত্ত্বেও সঙ্গীর সহিত মিলিত হতে পারে না। যারা পারে অনেকটা মলমূত্র ত্যাগ করার মতো প্রয়োজন অনুভব করে তীব্র প্রতিযোগীতার মাধ্যমে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়। প্রাণিদের লড়াই চলে খাদ্য নিয়ে, বাসস্থান নিয়ে, স্বজন নিয়ে, সমাজ নিয়ে, অঞ্চল নিয়ে, এদের একজনের মুখের খাবার অন্যজন নিয়ে নেয়। শিকারী শিকারে পরিণত হয় প্রায়ই। শিশু প্রাণিকে রেখে তার মা শিকারে বের হয়ে অন্য প্রাণির শিকারে পরিণত হয়ে যায়। কত অসহায় জীবন তাদের! একটু ভেবে দেখুন! মা প্রাণিটি তার বাচ্চা/ ডিম পেটে বহন করেই তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। বাচ্চা প্রসবের সময় কোন সাহায্যকারী থাকে না। থাকেনা কেহ ব্যাথিত হওয়ার। একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালাই এসব নিরীহ প্রাণিদের সাহায্যকারী হিসাবে সাহায্য করেন এবং জীবন চক্রকে বৃদ্ধি/ হ্রাস করে নিয়মতান্ত্রিকতায় শঙ্খলা স্থাপন করেন।

আপনার স্ত্রী সন্তান ধারণ করতে পেরেছেন জেনেই আপনি আনন্দে ভাসেন। সন্তানের প্রতি কর্তব্যবোধ উপলব্ধি করেন, সন্তানের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় নিযুক্ত হন। সন্তান ধারণকারীর যাবতীয় তদারকি করেন, এরপর প্রসবের সময় যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন সন্তানের আগমনকে নিরাপদ নিশ্চিত করার জন্য। এরপর অতীব যত্নের সহিত মা ও শিশুর সুরক্ষা করেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মহান স্রষ্টার সৃজিত, আপনার নিকট প্রেরিত শিশুটিকে আপন করে বড় করতে থাকেন। ভাবুনতো, কি অন্যায় করেছিল ঐ পশু-পাখি এবং প্রাণি সমাজেরা! যাদের সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের চাইতে লাখো কোটি গুণ বেশি!

তাদের কোন খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, আর্থিক নিরাপত্তা, এমনকি জীবনেরও নিরাপত্তা নেই। তাদের গায়ে একটি কাটা ফুটলে তারা যেমন কষ্ট পায় তেমনি আপনার গায়ে কাটা ফুটলে আপনিও সমান কষ্ট পান। তারা কষ্ট

পেলে চিৎকার করে। আপনি কষ্ট পেলে প্রতিকার/ ব্যবস্থা/ স্বজনদের আহব্বান করেন।

মহান আল্লাহ কেন এসব প্রাণিদেরকে কষ্ট দিচ্ছেন? আপনি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করেন, তারা কষ্ট পায়, অসহায়ের মত সময় অতিবাহিত করে। আপনার নানাবিধ নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়, তাদের কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না এবং প্রয়োজন হলেও পূরনের সহায়তাকারী না থাকায় প্রয়োজন না হওয়াটাই যাথার্থ হিসাবে বিবেচিত হয়। উপরন্তু আপনার প্রয়োজন হলে এসমস্ত প্রাণিদেরকে ইচ্ছা-মত, সাধ্যানুযায়ী জবাই/ হত্যা করে খান বা ধ্বংশ করেন, কাউকে কোন রূপ কৈফিয়ত প্রদান করতে হয় না।

মহান আল্লাহ আপনার মত প্রাণিকে মানুষ বানিয়ে বিবেক বুদ্ধি দিয়ে জীবনকে উপভোগ, রসালো করার স্বামর্থ্য দিলেন আর নিরীহ প্রাণিদেরকে নির্বোধ পশু/ প্রাণি বানিয়ে অসহায় অবস্থায় রাখলেন এবং আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করালেন! অবশেষে প্রস্থান করালেন নিজের দিকে। এসমস্ত প্রাণিদেরকে 'আল্লাহ' না দিলেন মানুষের মত সুখ শান্তি, ভালোবাসার প্রকাশ এবং না দিলেন খাদ্য, আশ্রয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা!

এত কিছু জানা বোঝার পরও আপনি-মানুষ যদি মনে করেন, পশু/ প্রাণিরা যেমন মরে গিয়ে মাটি হয়ে যাবে আমরাও মরে গিয়ে মাটি হয়ে যাব, কোন রূপ হিসাব বা কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে না! কোনরূপ শাস্তি, কষ্ট, ভোগ করতে হবে না ইত্যাদি!

তাহলে স্পষ্টভাবে বুঝে নিন, জেনে নিন, আপনার ভাবনা চিন্তা দ্বারা আপনি মহান স্রষ্টা আল্লাহকে অপরাধী সাব্যস্থ করছেন!

কারণ তিনি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে একশ্রেণির প্রাণিকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে কষ্টভোগ করালেন, অন্য শ্রেণির প্রাণিকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে শাসক হিসাবে নিযুক্ত করে আনন্দ ভোগের মজা করতে দিলেন! আপনি যদি ভাবেন পৃথিবীর পরবর্তী সময়ে উভয়ে মাটি হয়ে যাবে, কোনরুপ কর্মফল ভোগ করতে হবে না, তাহলে আপনার ভাবনায় আপনি আল্লাহতায়ালাকে তার সৃষ্টির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দোষে অভিযুক্ত করছেন! কিন্তু মহান পবিত্রতম সত্তা, মহান স্রষ্টা-আল্লাহ, কখনোই এমন করতে পারেন না! কখনোই না!

মানুষদের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, শাসক, শোষিত, রাজা, প্রজা, জ্ঞানী, মুর্খ, সুস্থ, অসুস্থ, সুন্দর, অসুন্দর ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের লোক জন আছেন। যাদের মধ্যে

ব্যাপক ব্যবধান আছে, কেহ গ্রাম্য, কেহ শহরে, কেহ বিশিষ্ট, কেহ সাধারণ, কেহ ধার্মিকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন, কেহ অধার্মিকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে, কেহ সারাজীবনে অঢেল অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়, কেহ দুবেলা পেটভরে খাওয়ার জন্য অশেষ কষ্ট করে থাকেন।

এমতাবস্থায় আমার আপনার ভাবনায় যদি মৃত্যুর পর কোনরূপ হিসাব নিকাশ না হয়, কোনরূপ প্রতিফল পাওয়ার বিধান না থাকে, একজন ভোগকরল, আরেকজন কষ্ট করল, কেহ অন্ধকারে থাকল কেহ আলোতে থাকল, এজন্য যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসিত না হতে হয় তাহলে (এজন্য) মহান আল্লাহতায়ালাকে অপরাধী হতে হবে! (আল্লাহ ক্ষমা করুন) মহান আল্লাহ তার নিজ ইচ্ছায় কাউকে সভ্য শহরে পাঠিয়েছেন! কাউকে বস্তিতে পাঠিয়েছেন! কাউকে সুস্থ অবস্থায় পাঠিয়েছেন কাউকে অসুস্থ অবস্থায় পাঠিয়েছেন! কাউকে ধনী করে পাঠিয়েছেন কাউকে ভিখারী করে পাঠিয়েছেন!

মহান আল্লাহর কসম! কসম! কসম! মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ নগন্য ক্ষুদ্র পৃথিবীবাসী নির্বোধ প্রাণিদের প্রতি কখনোই পক্ষপাতিত্ব মূলক অবিচার করতে পারেন না। কখনোই না! কখনোই না!

তিনি ন্যয়বিচারক অসীম ধৈর্যশীল, অসীম দয়ালু, মহান স্রষ্টা! মহান সম্মানের একমাত্র অধিকারী এবং অমুখাপেক্ষী!

মৃত্যুর পর তিনি অবশ্যই প্রত্যেকের কর্মের হিসাব নিবেন এবং প্রতিফল দিবেন। কর্মানুযায়ী প্রতিফল দেওয়ার দিনে তিনি যদি আপনার আমার মত ধারনাকারী ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদেরকে প্রাণিদের চেয়ে বাড়তি বিবেক, বুদ্ধি দেওয়া সত্ত্বেও তোমরা কেন প্রাণিদের মত জীবন যাপন করলে?

তোমরা কেন পশু পাখির মত লক্ষ্যহীন জীবন কাটিয়েছ? তোমাদের কর্মের দ্বারা আমাকে কেন প্রাণিদের প্রতি অন্যায়কারী সাব্যস্থ করেছ? তোমরা কেন অন্যান্য মানুষদের প্রতি আমাকে অপরাধী প্রতিয়মান করেছ তোমাদের কর্মজীবন দ্বারা?

এমতাবস্থায়, আল্লাহ যদি অপরাধীদেরকে শাস্তি না দেন তাহলে তাকে তার সৃষ্টির প্রতি জুলুমকারী হতে হবে। এবং সত্যিকার ভাবেই অপরাধী হতে হবে পক্ষপাতিত্ব দোষে, যদি না তিনি মানব জীবন জগৎ এবং মহান স্রষ্টার প্রতি উদাস, লক্ষ্যহীন, উদভ্রান্ত, পশুসম মানুষেদেরকে শাস্তি না দেন! তখন কোথায় যাবে আমাদের ক্ষমতা, রাজত্ব আর সম্পদের বাহাদুরী? বৃথা ব্যয় করা শ্রমের জন্য আক্ষেপ করা ব্যতীত করনীয় কিছুই থাকবে না। পৃথিবীর ক্ষমতা, রাজত্ব,

বাহাদুরী আর দাপট! পাপের বোঝায় এতটা অপমানিত হবেন যতটা সম্মানীত মনে করতেন পৃথিবীতে; বরঞ্চ আরও বেশী।

আপনার মৃত্যুর পর স্ত্রী অথবা স্বামী অন্য সঙ্গী গ্রহণ করবে, আপনার অর্জিত ধন-সম্পদ সন্তানাদি ভোগ করবে, আপনার নামও স্মরণ হবে না। অতীব যত্নে তৈরী বাড়ী-ঘর ভাগ-ভাটোয়ারা হয়ে যাবে। পৃথিবীতে শ্রমদ্বারা, মেধা দ্বারা, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করলে আপনার স্বজন সমাজ কখনো কখনো স্মরণ করবে মাত্র কিন্তু তাতে আপনার কি লাভ হবে! আপনি যদি আপনার সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন না করতে পারেন, তার নির্দেশিত পথে চলে ধার্মিক ব্যক্তি হয়ে আপনার জন্মকে স্বার্থক করতে না পারেন, এভাবে মৃত্যুবরণ করেন, এমতাবস্থায় সারা পৃথিবীর লোকেরা আপনার স্মরণে মোমবাতী, সুগন্ধী আর বিনম্র শ্রদ্ধায় আপনাকে স্মরণ করলেও আপনার কোন লাভ হবে না। কারণ আপনি মহান স্রষ্টা, মালিকের নিকট অপরাধী হয়েছেন! সুতরাং তার নিকট আপনার জন্য সুপারিশকারী হওয়ার মত যোগ্যতা কাহারও নেই। তার ক্রোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পথ থাকবে না কেননা নিজেকে ক্ষমতাধর মনে করে সমস্ত পথ রুদ্ধ করে আপনিই আজ অসহায় অবস্থায় স্রষ্টা সমীপে নীত হয়েছেন।

মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি কৌশলকে অতি সামান্য পরিমাণে হলেও উন্মুক্ত করেছে মানুষের আবিস্কৃত বর্তমান বিজ্ঞান। আমাদের আত্মজিজ্ঞাসিত হয়ে মহান স্রষ্টা মুখি হওয়া উচিৎ নতুবা কঠিন শস্তির সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত কোন রাস্তাই থাকবে না! এবং এটাই সত্য যদি আমরা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করি!

▶▶ প্রাণিবিজ্ঞানীরা/বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন কোটি কোটি কোষ দিয়ে মানব দেহ তৈরী। প্রতিটি কোষ সাইটোপ্লাজম ও প্রোটোপ্লাজমের মেলবন্ধনে প্রকাশিত। প্রোটোপ্লাজম জীবনের মূল গঠন ও গুনগত কাজের সকল বৈশিষ্টের প্রকাশ ঘটায় তাই একে প্রাণি কোষের মূল উপাদান বলা হয়।

সাইটোপ্লাজমের ভেতরে অবস্থান করে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে ক্রোমোজাম। ক্রোমোজামে থাকে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন ও অন্যান্য উপাদান। নিউক্লিক এসিড সদা জীবন্ত ও চলমান অবস্থায় থাকে।

নিউক্লিক এসিডে দুইটি উপাদান DNA এবং RNA। ডিএনএ কে জিন বলা হয়। ডিএনএ বা জিন জীবের আদি বস্তু যার অবস্থান সর্বপ্রকার জীবের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজামে।

কোষের মূল উপাদান নিউক্লিক এসিড সদা জীবন্ত। এটা পানিতে/ বাতাসে ভাসতে পারে মাটিতে যে কোন অবস্থায় থাকতে পারে। এর কোন মৃত্যু নেই তবে অন্য রূপে পরিবর্তীত হতে পারে।

মানব দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলো এবং এর চেয়েও ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র যে অংশগুলো রয়েছে (যাহা আমরা জানি বা না জানি অর্থাৎ বিজ্ঞান যাহা এখনও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি) তাহা কখনই ধ্বংস হয় না অন্যরুপে পরিণত হয় মাত্র।

আজকের বিজ্ঞান বলে 'মানুষ কোন বস্তু সৃষ্টি বা ধ্বংস কোনটাই করতে পারে না।' শুধুমাত্র আকার পরিবর্তন করে মাত্র, যাহা সম্পূর্ণ দৃষ্টিগত বাহ্যিক ভাবে। কোন বস্তুকে পুড়িয়ে বা তরল করা হলেও ঐ বস্তু সমূহ সৃষ্টির মূল উপাদানগুলো কোন কালেই ধ্বংস হয় না শুধুমাত্র অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়।

সাময়িক ভাবে মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহটি হতে তার আত্মাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর পর আত্মা দেহটিকে নিয়ে পৃথিবীতে অবস্থান করে অর্থাৎ পৃথিবীর জীবন কাটিয়ে কি নিয়ে/ কি অর্জন করে তার আপন স্রষ্টার নিকট ফিরে আসলো!

এসব বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে।

উত্তর দিতে পারলে/ আত্মিক কর্মগুলো করার মাধ্যমে পৃথিবীর জীবনটি দিয়ে আত্মার স্বরূপ উন্মোচন করতে পারলে আত্মাটির প্রতি স্রষ্টা সন্তুষ্ট হন। ব্যর্থ হলে/ আত্মিক অর্জন না থাকলে সেই আত্মাটিকে চিরকালীন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। শাস্তি ভোগ করে তার আত্মাটি এবং দেহটি।

আত্মা+দেহ উভয় দ্বারা সে যেমন পৃথিবীতে আনন্দ উল্লাস করেছিল তেমনি আত্মা এবং দেহ দিয়েই সে শাস্তি ভোগ করে। পৃথিবীর দেহ যেভাবে শাস্তি পেতে পারে বা পাওয়া সম্ভব বা পৃথিবীর দেহকে পোড়ালে বা পিটালে যে ভাবে কষ্ট পাওয়া সম্ভব ঠিক তেমন কষ্ট মৃত্যুর পরেও অপরাধী মানুষেরা ভোগ করে। এই সুখ ভোগ/ শাস্তি ভোগ চিরকালীন অর্থাৎ এর কোন সীমা রেখা নেই।

মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকট এটা একেবারেই সাধারণ বিষয়। আমরা কিছু সামান্য জ্ঞান লাভ করেছি এটাই বেশি। মহান 'আল্লাহ্' শাস্তি/ শান্তি প্রদান করবেন এটাই সত্য! (আমরা কিছু জানতে পেরেছি জ্ঞান অর্জন করেছি এটা প্রমাণ স্বরূপ মানুষদের ভাগ্য বলা যেতে পারে।)

আপনার আমার মতো নির্বোধদের নিকট মহান স্রষ্টা কর্তৃক শাস্তি প্রদান/ সুখ প্রদান বিষয়টি সহজবোধ্য হতে পারে যদি আমরা সত্যাশ্রয়ী ভাবনায় বিনীত হই!

মানুষের বীর্যে কোটি কোটি শুক্রানু থাকে যাহা খালি চোখে দেখা যায় না। একজন মানুষ সৃষ্টির জন্য একটি শুক্রানু হতে একটি ক্রোমোজাম প্রয়োজন হয়।

মহান পবিত্রতম স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা একটি শুক্রানু হতে একটি ক্রোমোজাম এবং একটি ডিম্বানু হতে একটি ক্রোমোজাম মোট দুটি ক্রোমোজাম দ্বারা/ ক্রোমোজামের অন্তস্থিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো দ্বারা ধাপে ধাপে মানুষ সৃষ্টি করেন।

মহান কৌশলতায় বৃদ্ধি ঘটিয়ে মানব আকৃতি দিয়ে তারপর মানব দেহটিতে 'আত্মা' প্রবেশ করান অসীম ক্ষমতায়। ক্ষুদ্র মানব দেহে আত্মা প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত দেহটি স্থবির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষ সমূহের সমষ্টি/ মাংসপিন্ড/ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত একটি ফলের মতো অবস্থায় থাকে। যার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে কিন্তু প্রাণির মতো রূপ তখনই পায় যখন এতে আত্মা প্রবেশ করে। এরপর পৃথিবী, এরপর আরও বৃদ্ধি, এরপর বৃদ্ধি লোপ পেয়ে ক্ষয়িষ্ণু হওয়ার পালা। দেহটি অসার হতে হতে এক সময় আত্মা বহন করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ মহান স্রষ্টার নির্ধারিত পৃথিবীর সময় শেষ হয়ে যায় তখন যে কোন কার্যকারণ সূত্রের মাধ্যমে আত্মাটি দেহ ত্যাগ করে থাকে। আমরা মৃত দেহটি নিয়ে কি কি করি বলার দরকার নেই। এর পর কবর দেই, সমাহিত করে রাখি, পুড়িয়ে ফেলি, তরল করে ফেলি।

কবর দিলে পচে যায়, সমাহিত করলে পচে যায়, পুড়ালে ছাই ভস্ম হয়ে যায়, তরল করলে পানি হয়ে যায়, খেয়ে ফেললে মল হয়ে যায়, ইত্যাদি।

কিন্তু মানব কোষের ক্ষুদ্রতম অংশ নিউক্লিক এসিড, ক্রোমোজাম, জিন, আরএনএ, এগুলো কি নিঃশেষ হয়ে যায়?

কখনোই না।

হাঁ! তবে নিঃশেষ হয়, বিলীন হয় আমাদের মানব দৃষ্টি হতে। এর বেশি কিছু নয়! দেহটি ক্রোমোজাম/ শুক্রানু/ নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমান অবস্থায় পরিণত হয়। আমরা শুনি, দেখি, ব্যথা পাই, আরাম পাই সবই মানব কোষগুলির সমষ্টিগত অবস্থার কারণে আমাদের নিকট উপলব্ধি যোগ্য হয়, পৃথিবীর জীবনের কারণে বোধ ও প্রমাণ যোগ্য হয়। মৃত্যুর পরে দেহটি আমাদের দৃষ্টিতে বিলীন হয়ে যায়। দেহ তার আকৃতি ত্যাগ করে পৃথিবীর দৃষ্টিতে মাটিতে মিশে যায়, ছাই হয়ে যায় কিন্তু দেহের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অংশগুলো সম্পূর্ণ ঠিক থাকে (শুধুমাত্র আমাদের দৃষ্টিতে আড়াল হয়।)

আত্মাটি শাস্তিভোগ করার কর্ম করলে শাস্তি পায় এবং সুখ ভোগ করার কর্ম করলে সুখ পায়। শাস্তি ভোগ/ সুখ ভোগ করতে থাকে দেহ এবং আত্মা মিলে। মানব দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো দিয়েই শাস্তি ভোগ করতে থাকে।

কাহারো দেহ ভস্ম ১৮০টি ভাগে বিভক্ত করে ১৮০টি দেশে রাখা হলে অথবা পুরো পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে দিলেও সেই দেহের আত্মাটি সমগ্র পৃথিবীস্থিত দেহ কোষগুলোকে নিয়েই কষ্ট ভোগ করবে। এমতাবস্থায় কষ্ট কমতো হবেই না বরঞ্চ বাড়বে কারণ কষ্ট বিষয়টা কেমন তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ আমরা 'দেহ' দিয়ে করেছি, দেহের বাইরে করিনি। এই পরিমাপ যন্ত্রটাই যখন থাকবে না তখন আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত শাস্তি পরিমাপের চেয়ে বেশি হতে পারে এবং বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

আত্মার ক্ষমতা আমরা জানিনা। পৃথিবীর বস্তুবাদ ভোগবাদ দিয়ে মানবাত্মার ক্ষমতা কল্পনা করা সম্ভব নয়। একটি মানুষ যখন আত্মিক মানুষে পরিণত হবে এবং আত্মার স্রষ্টা মহান 'আল্লাহ্'তে বিনীত হয়ে মাথা ঠুকবে অবিরত, তখনই আত্মার স্বরূপ উৎঘাটিত হবে; তখনই জানবে আত্মা কি!

'আত্মা' একটি ক্ষুদ্র স্থানে থাকতে পারে/ একটি দেহতে থাকতে পারে অথবা পৃথিবী ব্যাপি বিস্তৃত অবস্থায়ও থাকতে পারে অথবা আত্মার প্রকৃত অবস্থাটা কেমন হতে পারে তাহা একমাত্র মহান আল্লাহ ভালো জানেন।

আত্মা এবং দেহ শাস্তি ভোগ করবে, চিৎকার করবে, তার পার্শ্বে বসবাসকারী মানুষদের কথা শুনবে কিন্তু তার কান্না, আর্তনাদ পৃথিবীর মানুষেরা শুনবে না। কারণ দেহ কোষগুলো দেহের আকৃতি ত্যাগ করেছে! মুখের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো আছে, কান্নার কণ্ঠের ক্ষুদ্র অংশগুলো আছে কিন্তু কণ্ঠ নেই! পৃথিবীর আলো বাতাসে ধ্বনি সৃষ্টিকারী উপাদান গুলো নেই। লজ্জা স্থানের ক্ষুদ্র অংশ গুলো আছে কিন্তু লজ্জা স্থান নেই, চিৎকার হাহাকার সবই আছে প্রকাশ মাধ্যম নেই। অর্থাৎ দেহের ক্ষুদ্র অংশগুলো এবং আপনি/আপনার আত্মা (যাহা আপনি) দ্বারা সুখ/কষ্ট ভোগ করবেন কেহই জানবে না। এটাই সত্য! বিশ্বাস না হলে শুধুমাত্র অপেক্ষা করুন! বিশ্বাস হলে অপেক্ষার সহিত করণীয় কর্মগুলো সম্পাদন করুন!

▶▶ ইসলাম ধর্মের পবিত্র হাদিস শরিফে আল্লাহর প্রিয় মানব মুহাম্মদ (সঃ) মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন আজকের বিজ্ঞান তার সত্যতা জাহির করছে। তার পরও আমরা যদি অন্ধকারে থাকি মানুষ হিসেবে তাহা

অত্যন্ত দুঃখ জনক। অজ্ঞতা/ মূর্খতার দোহাই দিয়ে জঙ্গলের মানুষেরা বাঁচতে পারবে কিন্তু আমরা সভ্য পৃথিবীর সভ্য/ শিক্ষিতরা কখনোই বাঁচতে পারবো না।

মৃত্যু! মৃত্যু কি?

আমরা নির্বোধ! মৃত্যু হলো আমাদের মানুষদের বোঝানোর জন্য, পৃথিবী ত্যাগ করে কর্মফলের দিকে ধাবিত হওয়ার মাধ্যম! পৃথিবীর জীবন ছাড়া কোথাও মৃত্যু নামক পৃথিবীয় বোধগম্য বিষয়টি নেই।

প্রাণিদের আত্মাগুলো পৃথক করার জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন। দেহগুলোকে অন্যরূপে পরিণত করে আত্মার সংস্পর্শ সহকারে শাস্তি/সুখ ভোগ করানোর জন্য মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ' প্রতিটি প্রাণির জন্য মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছেন।

মানব দেহের মাধ্যমে/জীবন্ত ক্ষুদ্রতম অংশগুলোর সমষ্টিগত আকৃতির মাধ্যমে মহান আল্লাহ প্রাণিদের আত্মার প্রকাশ/ আবির্ভাব ঘটান। আত্মার মাধ্যমে প্রাণি তার দেহের জীবন্ত কোষগুলোর সমষ্টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপে বিরাজ করে, বিচরণ করে। পৃথিবীর এই বিচরণ ক্ষেত্র হতে আত্মাদের সরিয়ে/ পৃথক করে আপন স্রষ্টামুখি করার জন্য/ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় মৃত্যুর! পৃথিবীর জীবনের কর্মফল ভোগও হয় মৃত্যুর মাধ্যমে।

প্রাণিদের/ বিশেষত মানুষদের 'আত্মা' সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বে-খবর। বিজ্ঞান আত্মা সম্পর্কে কিছুই জানেনা। জানবেও না কোনদিন। কারন আত্মা সম্পর্কে জানতে হলে আত্মার স্রষ্টা 'আল্লাহ' মুখী হতে হবে দুনিয়ার ভোগ আনন্দ বাদ দিয়ে। আমাদের তথাকথিত বিজ্ঞান ভোগ আর বস্তুবাদ ত্যাগ করতে পারবে না আর আত্মা সম্পর্কে জানতেও পারবে না কখনো!

আল্লাহ উদ্ভিদকে প্রাণিদের মতো আত্মা দেননি কিন্তু বৃদ্ধি এবং অন্যের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা করেছেন মহান কৌশলতায়।

এই তথাকথিত চতুর্থ/ পঞ্চম প্রজন্মের বিশ্বের দ্বারে (ধ্বংসোন্মুখ বিশ্বের দ্বারে) দাড়িয়ে বিশিষ্ট/ জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি পশু পাখিদের মতো জীবন পরিচালনা করতে থাকেন (অথচ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষনা/আবিষ্কারে নিমগ্ন থাকেন) মহান স্রষ্টা আল্লাহর কথা কখনোই ভাবেন না! মনে করেন! মরিলে শেষ হয়ে যাবো! কি হবে আর!

এসব হলো সরল উক্তি, সঠিক সংগত এবং যৌক্তিক নয়; লজ্জাকর বটে!

আমাদের জীবনে অবশ্যাম্ভাবী মৃত্যু সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ উদাস আচরণ করি। অথচ ভেবে দেখুন! আমরা পৃথিবীতে বসবাস করা ও বাসগৃহ সম্পর্কে সব সময় ভাবি, কি খাব, কি পরব এবং ভবিষ্যত জীবনের কথা কল্পনা করে, আর্থিক নিরাপত্তা অর্জনে সব সময় পরিশ্রম করি। সামাজিক ভাবে সাচ্ছন্দ্য সহকারে বাচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। যদিও যে কোন সময় মৃত্যুর মাধ্যমে আমার পৃথিবীর জীবনের ইতি ঘটতে পারে। যে কোন মহুর্তে মৃত্যুর দূত এসে আমাকে এই পৃথিবী থেকে নিয়ে চলে যেতে পারে অজানা গন্তব্যে। সত্যিকার অর্থে তখন আমার কি পরিণতি হবে! আমার দেহ হয়ত পচে যাবে বা পুড়ে যাবে, আমার সচল দেহকে অচল হওয়ার মূহুর্তে আমার আত্মার কি অবস্থা হবে! আমার আত্মা আর আমার দেহ এই দুটোকে পৃথিবীতে আসার পর থেকে পৃথক অবস্থায় কখনো দেখিনি! পৃথিবীতে বসবাস করা অবস্থায় আত্মা এবং দেহ এই দুয়ের সমষ্টিতেই আমি মানুষ হিসাবে সচল ভাবে চলাচল করতে সক্ষম হই। একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমেই আমার দেহ থেকে আত্মা চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন পৃথকাবস্থায় আমার আত্মার অবস্থাটা কেমন হবে?

আমার দেহটিকে আমার স্বজনেরা ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবী থেকে আড়াল করার ব্যবস্থা করবেন। কেহ মাটি চাপা দিবেন কেহ পুড়িয়ে দিবেন, এমতাবস্থায় আমার দেহটি আস্তে আস্তে ফুলে ফেপে দূর্গন্ধ সৃষ্টির মাধ্যমে এক সময় মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। আমি কি কখনো আমার জীবনের ১০ অথবা ২০টি মিনিট নিশ্চিত আগত এই পরিণতি সম্পর্কে কখনো ভেবে দেখেছি?

সোনার দেহের রক্ষনাবেক্ষণ করলাম। স্বাস্থ্য রক্ষা, দেহ রক্ষা আর সৌন্দর্যের পিছনেই ব্যায়িত হলো সারাটি জীবন! প্রিয় অঙ্গ মুখটি ফুলে যাবে এবং পোকা মাকড়ে খেয়ে ফেলবে এবং সারা জীবন যে পাকস্থলি আর জননিন্দ্রের স্বার্থে মজা করলাম, কোথায় সেই ইন্দ্রিয় আর পেট! পচে মাটির সাথে মিশে গেল!

আমরা দেখি যখন কোন মানুষের প্রাণ স্বাভাবিক ভাবে দেহ থেকে উৎখাত না হয় অর্থাৎ কোন দূর্ঘটনা বা হত্যার মাধ্যমে কোন লোকের মৃত্যু ঘটে বা আত্মার দেহ ত্যাগ ঘটে (আমরা যদি দেখতে পাই সেই দেহ ত্যাগের দৃশ্যটি) তখন প্রচন্ড কষ্ট পাই, ব্যাথিত হই এবং কান্না চলে আসে, সেই আত্মার দেহ ত্যাগের দৃশ্যটি দেখে। স্বাভাবিক ভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় বা কোন আত্মার দেহ ত্যাগের সময় কি কোন প্রকার কষ্ট হয় না? কেন আমরা ভাবি না?

ভেবে দেখুন! মহান ক্ষমতাধর আল্লাহতায়ালা যখন আপনার বাবার বীর্যের এক বিন্দুর চেয়েও ক্ষুদ্র একটি অংশ মায়ের ক্ষুদ্র পরিমাণ ডিম্বানুর সহিত মিলন ঘটিয়ে সুরক্ষিত ক্ষুদ্র অন্ধকারে আপনার আমার দেহ পিন্ডের ক্ষুদ্র একটি অংশ সৃষ্টি করেছিলেন, পরবর্তীতে যার বাহ্যিক আকৃতি ছিল জমাট রক্ত পিন্ডের মত। এরপর মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ' তার ইচ্ছায় আমাদের আত্মাকে ক্ষুদ্র মাংস পিন্ডে প্রবেশ করিয়েছিলেন। এরপর আমরা কিভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছি বিজ্ঞানের মাধ্যমে তা আমরা জানতে পেয়েছি। আমাদের আত্মা যখন আমার ক্ষুদ্র দেহ পিন্ডে প্রবেশ করেছিল তখন কি কোন প্রকার কষ্ট হয়েছিল?

জানার প্রয়োজন বোধ করি না। এই বিষয়টি যেহেতু অপ্রয়োজনীয় তাই মাথা ঘামানো উচিত নয় বলে ভাবি।

আমরা কষ্ট ভোগ এবং সুখ ভোগ বা বোধের যে জ্ঞান লাভ করি তা মূলত দেহ কেন্দ্রিক। দেহ নামক বস্তুটির উপর কোন প্রকার আঘাত আসলে আর তার অভ্যন্তরে যদি প্রাণ থাকে তাহলে সেই বিস্তৃত প্রাণ কষ্ট পায়; যা দেহতে বিন্যস্ত অবস্থায় থাকে। আত্মা ব্যতীত পৃথিবীর এই স্বাভাবিক দেহ বোধ শক্তির বাইরে সুতরাং আত্মা যখন দেহে প্রবেশ করে তখন তাতে কষ্ট হয় না এটাই স্বাভাবিক। আত্মাকে প্রবেশ করানো হয় সে প্রবেশ করে না। এরপর যতদিন দেহতে আত্মা থাকে ততদিন আত্মা কষ্ট বোধ করে এবং তার দ্বারা কষ্ট অনুভূত হয়। সুখ বোধ বা আনন্দ লাভের বিষয়টিও এমন। একজন মানুষ যখন আনন্দ অনুভব করেন, সুখ ভোগ করেন, তখন তা প্রকাশিত হয়/ অনুভূত হয় দেহের মাধ্যমে, কিন্তু অনুভব করে আত্মা বা প্রাণটি।

ক্ষুদ্র মাংস পিন্ডটি ক্রমাগত ভবে বড় হতে হতে যখন মায়ের পেটের অনুপযুক্ত হওয়ার মতো অবস্থায় পৌছে তখন তাকে 'শিশু' অবস্থায় বাহির করা হয় বা স্বাভাবিক ভাবে বের হয়ে আসে। মাতৃগর্ভ থেকে বের হওয়ার পর প্রতিটি শিশুই কান্না ধ্বনির মাধ্যমে পৃথিবীতে আসার বার্তা প্রকাশ করে। প্রতিটি শিশু কেন ক্রন্দন করে এর যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। আপনারা জানার চেষ্টা করুন!

প্রকৃত কথা হলো, দেহতে বদ্ধ আত্মাটি পৃথিবীতে আসার জন্য বা মায়ের পেটে অবস্থানকালীন স্থান ত্যাগ করতে কোন ভাবেই ইচ্ছুক থাকে না বিধায় পৃথিবীতে আসার সময় তার আত্মাটি প্রচন্ড কষ্ট অনুভব করতে থাকে এবং হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ নাড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু তার দেহ পরিপূর্ণ ভাবে প্রাণ

শক্তিকে বা আত্মাকে বহন বা কর্মক্ষম রাখার মতো উপযুক্ততায় থাকে না (তবে মুখ প্রধান অঙ্গ হিসাবে খাদ্য গ্রহণের জন্য সচল থাকে) বিধায় মুখের দ্বারা আত্মার অভিব্যক্তি ঘটে এবং পৃথিবীর বাতাস তার নাকে মুখে প্রবেশ করে একটি ধ্বনির সৃষ্টি করে একে আমরা কান্না হিসাবে অভিহিত করি। যখন কোন শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সময় স্বাভাবিক ভাবে কান্না কাটি না করে তখন তার প্রয়োজন হয় ডাক্তারের পরামর্শের! কারণ এই কান্নাটাই স্বাভাবিক বিষয়।

শিশুটি যখন পৃথিবীতে বড় হতে থাকে তখন তাকে আমরা নানা প্রকার সুরক্ষার মাধ্যমে লালন পালন করতে থাকি। সে যেটার জন্য উপযুক্ত নয় সে সেটা করতে চায়। যা করলে তার ক্ষতি হবে সেটা করতে চায়। শিশু অবস্থায় আমরা শুভাকাঙ্খিরা মূলত শিশুটিকে/ আত্মাটিকে দেহের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হতে রক্ষা করে থাকি।

'শিশু' বলা হয় মানব দেহের ক্ষুদ্র অবস্থাকে। তার অভ্যন্তরে হৃদপিন্ডকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেহে সঞ্চারিত মহান আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি যে 'আত্মা' বিস্তার করে থাকে তার নেই কোন শিশু অবস্থা, নেই কোন প্রাপ্ত বয়স্কতা এবং নেই কোন বৃদ্ধাবস্থা! জেনে রাখুন!

আত্মা সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানেনা, না জানে কোন বিজ্ঞানী, না জানে কোন গবেষক, না জানে কোন দার্শনিক! পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়েও আত্মা সম্পর্কে কিছু জানতে পারেননি এবং পারবেনও না।

বিজ্ঞান বলতে আমরা যে আনন্দ আহব্বান আর বস্তুবাদী, ভোগবাদীতার দামাঢোলের আয়োজনকে বুঝাচ্ছি আসলে তা এখানে এত ব্যর্থ, এত ক্ষুদ্র, এত নগণ্য, এত হীন যে কোন উদাহরণ দিলেও বড় হয়ে যাবে!

একটি আত্মা/প্রাণ সম্পর্কে মহান স্রষ্টা, মহা ক্ষমতাধর অপূর্ব সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালার বক্তব্য ব্যতীত কোন তথ্যই বিজ্ঞানী নামক বস্তুবাদী মানুষদের জানা সম্ভব নয় ভাবাও সম্ভব নয়। তবে মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ' যাকে এই সম্পর্কে সামান্য পরিমাণ জ্ঞান দিবেন তিনি ব্যতীত তা সম্পর্কে কেহ জানতে পারবে না। এই বিষয়টি শিক্ষা বহির্ভূত, অনুভূতি বহির্ভূত, পৃথিবী সম্পর্কীয় সমস্ত কিছু বহির্ভূত; বিশেষ জ্ঞান। যা আত্মার স্রষ্টার সাহায্য ব্যতীত লাভ সম্ভব নয়।

ক্ষুদ্র শিশুকে পাগলের চেয়েও বেশি কিছু বললে ভুল হবে না। তার কার্যাবলী, আচরণ ইত্যাদি সবকিছুই অস্বাভাবিক, অন্যরকম। কোন ক্ষুদ্র শিশু কাউকে খুন করে ফেললেও তাকে শিশুই বলা হবে অন্য কিছু বলা হবে না। জেনে রাখুন

আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি, শিশুত্ব পৌড়ত্ব কোনটাই নেই। স্থান, কাল, পাত্র সর্বক্ষেত্রে আত্মার অবস্থান একই, কার্যাবলী একই যদি না আত্মার স্বরূপ উন্মোচন করে তাকে না চেনা বা বিশেষ কিছু অর্জন না করা যায়!

শিশুটিতে 'আত্মা' তার স্বকীয়তা প্রকাশ করতে পারে না কেননা তাকে স্বকীয় রাখার মতো মস্তিষ্ক, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ যথার্থ পূর্ণ অবস্থায় পৌছেনি। তাই তাকে শিশু হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। আত্মা পরিপূর্ণ কিন্তু আত্মার আচরণ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার যে মাধ্যম দেহ, সেই দেহটি পরিপূর্ণ না থাকার কারণে আত্মা শিশুটিতে আবদ্ধ থেকে শিশুত্ব বরণ করতে বাধ্য হয়। এর পর শিশুটি বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাথে সাথে ক্রমান্নয়ে 'আত্মা' তার কার্যাবলী প্রকাশে অগ্রগামী হয়ে উঠে। 'আত্মা' প্রকাশিত হয়, প্রচারিত হয় দেহ দ্বারা। দেহের মাধ্যমে আত্মা আনন্দ চায়, তৃপ্তি চায়, সুখ চায়, দেহ আর আত্মা দুটিতে মিলে সুখ শান্তি উপভোগে তৎপর হয়। এমতাবস্থায় মজা/ আনন্দ/ হুল্লোল ভাগাভাগি করে নেয় আত্মা আর দেহ। এই দেহের মাধ্যমে দেহ দিয়ে আনন্দ উপভোগ করে নেয় 'আত্মা' নামক মহান সৃষ্টি-কর্তার সৃষ্টি। স্বাভাবিক অর্থে আত্মা কখনোই কষ্ট চায় না আত্মা চায় না ক্ষুধার্ত থাকতে, আত্মা চায় না আনন্দ ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে মগ্ন থাকতে। আত্মার জন্য উপযুক্ত ভালো যে কাজ গুলো আছে যেমন ইবাদত করা, ত্যাগ করা, অন্যের মঙ্গলে নিজের শ্রম স্বীকার করা, মহান স্রষ্টার প্রতি অনুগত থাকা।

আত্মা এইসবে আগ্রহী হলে দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলোকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। যেহেতু, আত্মার অনুভুতি দেহ দ্বারা তাই আত্মা দেহকে কষ্ট দিয়ে নিজে আনন্দ উল্লাস থেকে বিচ্যুত এবং সেই সাথে কষ্ট স্বীকার করতে ইচ্ছুক থাকে না।

পৃথিবীতে মানুষের জন্য মঙ্গলজনক উপকারি প্রতিটি কর্মই কষ্টকর। মহান স্রষ্টা মানুষের সমষ্টিগত মঙ্গল চান কিন্তু সেই মঙ্গল জনক কাজ গুলো আত্মা এবং দেহের জন্য আনন্দ বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়! আত্মা পূর্ণ থাকে দেহটি কাঁচা থাকে। দেহটিকে কাঁচা রাখা হয় এজন্য যাতে দেহটিকে দিয়ে 'আত্মা' ভালো মন্দ উভয় কার্যাবলী প্রকাশ ঘটাতে পারে। অভিভাবক স্বজন সমাজ, পিতা-মাতার শিক্ষা চিন্তা চেতনা দ্বারা, শিশু দেহটির মাধ্যমে আত্মা তাদের অভিভাবক সমাজ স্বজনদের চিন্তা-চেতনা ভাবনা-বোধের প্রকাশ ঘটাতে পারে। শিশুরূপী আত্মা ধারী দেহটি বড় হয়ে পিতা-মাতা ও স্বজনদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে। 'আত্মা' এবং 'দেহ' এই দুয়ের সমষ্টিতে পৃথিবীতে বিচরণকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত,

প্রভূত্ব স্থাপনকারী প্রাণিটির নাম মানুষ। পৃথিবীতে মানুষের অবস্থানকাল শেষ হয়ে এলে আত্মাকে কোন না কোন ভাবে দেহ ত্যাগ করিয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ নিজের দিকে প্রত্যাবর্তন করান।

এমতাবস্থায় তার অর্জনটুকু সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবী থেকে নানারূপ আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে আড়াল করা হয় কারণ তার আত্মা এবং দেহ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়েছে। আত্মাটি দেহের নিকটে কিছু সময় অবস্থান করতে থাকে এবং সে অনাগত ভবিষ্যতের শঙ্কায় বিমর্ষ হয়ে পড়ে এবং ভাবতে থাকে! তার অতীত অর্জন যদি দেহ নামক বস্তুর মতো স্থুল, স্থবির, পৃথিবীতে দৃশ্যমান বস্তুর সদৃশ হয় বা পৃথিবীতে বিস্তৃত, অবস্থানকারী হিসেবে থাকে এমতাবস্থায় সে এ সমস্ত অর্জনের কথা ভাবতে থাকে এবং এগুলো হেতু শুন্যতা অনুভব করে।

যেহেতু পৃথিবীর এই সমস্ত অর্জনগুলো দেহ কেন্দ্রিক কিন্তু দেহটি অসার অবস্থায় পড়ে থাকে বা ধ্বংস হওয়ার কারনে তার অর্জনগুলোকে সে সঙ্গী হিসাবে/ পাথেয় হিসাবে বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তার দেহত্যাগ করা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়ে। সে কোথায় যাচ্ছে কিছুই জানেনা, কোথায় তার ভবিষ্যত, কি তার পরিণতি ইত্যাদি নিয়ে সে ভাবতে থাকে।

তার স্মরণ হতে থাকে সেই সময়কার কথা যখন সে পৃথিবীতে আসতে চাচ্ছিল না কিন্তু তার পরও আসতে বাধ্য হয়েছে। তার স্বজনেরা তার প্রতীক্ষায় অপেক্ষামান ছিল এবং মহাযত্নে তাকে লালিত পালিত করা হয়েছে। এবং সে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছিল। এহেন পরিস্থিতে স্বজন সমাজের প্রতি মায়া, ভালোবাসা তাকে দ্বিগুন যন্ত্রণা কাতর করে তোলে। এখন তাকে যেখানে যেতে হচ্ছে বা নেওয়া হচ্ছে, সেখানে কি তার স্বজন বা হিতাকাঙ্খী আছে?

যদি পৃথিবীতে আসার সময়ে যেরূপ হিতাকাঙ্খী ছিল যাদের মাধ্যমে সে লালিত পালিত হয়েছে সেরূপ কোন হিতাকাঙ্খি না থাকে (যেহেতু তার সঙ্গে পৃথিবীর কোন অর্জন নেই বা পৃথিবীর বস্তুবাদী অর্জন নিয়ে যেতে পারছে না) তাহলে তাকে সম্ভবত কষ্ট ভোগ করতে হবে! কঠিন একাকীত্ব এবং অতীত কর্মকান্ডে সে উপলব্ধি করতে পারে তার পরিণতি, যেহেতু সে শুন্যহস্ত এবং কোন প্রকার আত্মিক অর্জন তার নেই!

পূণ্যবান/ সৎকর্মশীল/ মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তিদের, দেহ এবং আত্মা এই দুইয়ের অবস্থানকাল শেষ হয়ে এলে সে যখন পৃথিবীর পরবর্তী জীবনে গমন করে, তখন সে কষ্ট অনুভব করতে থাকে এবং পচনশীল/ ধ্বংসশীল দেহের কথা ভাবতে ভাবতে অনুতাপ করতে থাকে। তার পৃথিবীতে কোন উল্লেখযোগ্য অর্জন ছিলনা যা সে বহন করে নিয়ে আসতে পারে। এমতাবস্থায় তার চিন্তিত আত্মাটির নিকট পৃথিবীতে করনীয় সৎ কর্মগুলো/ অদৃশ্য আত্মিক অর্জনগুলো তার নিকটবর্তী হয় এবং তাকে অভয় দিতে থাকে। পৃথিবীতে অবস্থানকালীন সময়ে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তার নিজ আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, সেগুলো তার স্মরণে আসে এবং আগত ভবিষ্যত সময়ের সম্পর্কে জ্ঞান উন্মোচিত হয় এবং আত্মাদের উর্ধ্বতন একাধিক বা অন্যান্য নৈকট্য প্রাপ্ত সৃষ্টিদের আমন্ত্রণ সহকারে উর্ধ্বগামী হয় এবং তার ভালো কর্মের নিকট ভবিষৎ ফল ভোগের বাস্তব চিত্র সে দেখতে পায়। অনেক সৎ কর্মশীল মানুষ মৃত্যুর অতীব কষ্টের মাঝেই (তার আত্মা) দেখতে থাকে তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল! এমতাবস্থায় তার মৃত্যু কষ্টও কম অনুভূত হয়। পৃথিবী পরবর্তী সময়ে পদার্পন করেই সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা মহান স্রষ্টার প্রতিদানে ধন্য জীবনে অভিষিক্ত হন।

আমরা ভাবিনা, চিন্তা করিনা সেসব বিষয়ে, যেসব সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত! অথচ এমন বিষয় বস্তু আমাদের মূল লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছি যা আমাদের কোন কাজে আসবে না; মূল্যহীন স্থবির হয়ে আক্ষেপ বৃদ্ধি করবে।

মানুষের সমস্ত জীবনের মধ্যবর্তী সময়ের মূল্যই অধিক এই সময়ে দেহের দাম আছে, কর্মের দাম আছে, অর্জিত সম্পদের মূল্যায়ন সম্ভব। এমন সময়ে সমাজ আপনাকে পাশে চায়, কাজে লাগাতে চায়, সংসার আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সর্বোপরি, সমস্ত কিছুতেই আপনার প্রয়োজনীয়তা স্থির হয়। তেমনি ভাবে মহান স্রষ্টা যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও এই মূল্যবান সময়টাতে আপনার আনুগত্য, আপনার মানষিকতা এবং এই দুইয়ের কর্মমুখী বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করেন।

আপনাকে স্থির করতে হবে আপনার জীবনের মূল্যবান সময় আপনি কার নিমিত্তে ব্যয় করবেন!

আপনি কি স্রষ্টার আনুগত্য অর্জনের পিছনে সমগ্র জীবন ব্যয় করার লক্ষ্যে দুনিয়ায় প্রয়োজনীয়তা পুরণ সাপেক্ষে সময় ব্যয় করবেন! অথবা দুনিয়ায়

প্রতিষ্ঠার পিছনে, অর্জনের পিছনে, সময় ব্যয় করার মাধ্যমে জীবন অতিবাহীত করবেন? অথবা সামান্য কিছু সময়ের জন্য মহান স্রষ্টার আনুগত্য করবেন?

▶▶ পৃথিবীতে সামান্য কিছু সময় ভালো ভাবে বসবাস বা সুখ সাচ্ছন্দ লাভ করার প্রত্যাশায় আমাদের কর্মক্ষম সময়ে কর্মক্ষম দেহটি বিনিয়োগ করি সমাজ ও রাষ্ট্রে। বিভিন্ন কর্মের দ্বারা প্রতিটি মানুষ প্রত্যাশা করি সফলতা অর্জনের মাধ্যমে সুখি ও প্রতিষ্ঠা লাভের। দশ বিশ হাজার টাকা উপার্জনের জন্য এত কঠিন জীবনকে বেছে নেই যার প্রকৃত কোন কারণ/ যথার্থতা নেই। অথচ মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ' অশ্লীল/ বাহ্যিক নাপাক বীর্যদ্বারা আমাদেরকে সৃষ্টি করে পবিত্র শুদ্ধ করার পথে আনয়ন করেছেন। তার সৃষ্টির দ্বারাই আমরা প্রতিটি ক্ষণ অতিবাহিত করছি/ জীবন ধারণ করছি। আমরা সমাজ রাষ্ট্র কর্মে মগ্ন হয়ে তাকে ভুলে গিয়েছি। তার আনুগত্য তো করছিই না বরঞ্চ তার বিরোধী কর্ম ও জীবনে নিজেকে নিয়োজিত করেছি! তার বিধানের বিরোধী জীবন আমরা বেছে নিয়েছি! সৃষ্টি হিসাবে এটা সম্পূর্ণই অনুচিত। আমাদের অজ্ঞতা, বিভ্রান্তিকতা পূর্ণ মানষিকতা এবং চিন্তা চেতনার দৈন্যদশার অবসান করার মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধানে আত্ম-জিজ্ঞাসু হওয়া উচিত।

আমাদের প্রতিটি মানুষের নিকট নিশ্চিত আগমনকারী মৃত্যু সম্পর্কে পরিপূর্ণ এবং স্পষ্টত জ্ঞান, উপলব্ধি, এবং আত্মসচেতন হওয়া প্রয়োজন! সর্বোপরি মৃত্যুর কষ্ট এবং পরবর্তী জীবন সম্পর্কে পরিষ্কার উপলব্ধি-পূর্ণ জ্ঞান রাখা উচিত!

কেননা আমাদের প্রত্যেককে মৃত্যুর পেয়ালায় যে জীবনামৃত রয়েছে, (যার মাধ্যমে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে) তার স্বাদ গ্রহন করতেই হবে। কোন প্রাণিই বাঁচতে পারবেনা।

একটি জীবিত মুরগিকে জবাই করলে যে পরিমাণ কষ্টের মাধ্যমে তার প্রাণটি দেহচ্যুত হয় (তার কোন বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়) এমন ভাবে একটি গরুকে যখন জবাই করা হলে, তার কি পরিমাণ কষ্ট হয়, তার দেহ থেকে প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ার বিষয় গুলো নিয়ে যদি আমরা ভাবি তাহলে অতীব কষ্টকর ধারনা ব্যতীত অন্য কোন কিছুই অর্জিত বা অনুভব করা সম্ভব হয় না। এরূপ ভাবে অন্য যে কোন প্রাণিদের ক্ষেত্রে তাদের দেহ এবং প্রাণের পৃথকী-করণের সময়টায় আমরা অবর্ণনীয় কষ্টের ধারনা ব্যতীত অন্য কোন কিছু অবলোকন করি না।

মানুষদের কথায় আসুন, আপনার বৃদ্ধ দাদা, দাদি, নানা-নানি, বাবা-মা স্বজনদের কথা একটু ভেবে দেখুন! বার্ধক্যের কারণে আপনার এসমস্ত নিকট আত্মিয়গণ কথা বলার শক্তি হারিয়েছিলেন, অনেকে নিশ্চল অবস্থায় বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এরপর কোন একদিন তাদের আত্মা/ প্রাণ আপনার চোখের সামনে অথবা আপনার আত্মীয়দের চোখের সামনে দেহ ত্যাগ করে অজানায় হারিয়ে গেছেন। আপনি একটু ভাবুন, আপনার যে আত্মীয়ের সঙ্গে আপনার বা-মার সম্পর্ক ছিল তার দেহটি পড়ে আছে আত্মা চলে গেছে। এমতাবস্থায় দেহটি কত মূল্যহীন অবস্থায় পর্যবসিত হয়ে পড়েছে!

আপনার সম্পর্ক ছিল আপনার 'বাবা' রূপী আত্মার সহিত, তার দেহের সহিত না। যদি তার দেহের সহিত সম্পর্ক থাকত তাহলে আপনি যে কোন উপায়ে হোক আপনার এমন হিতাকাঙ্খী স্বজনকে এভাবে মাটিতে পচার অপেক্ষায় অথবা চোখের সামনে পুড়ে ফেলতেন না। আপনি অবশ্যই জানেন 'দেহ' খোলস ব্যতীত অন্য কিছুই নয় এবং আপনার স্বজনটি আসলে 'আত্মা'; যার সহিত আপনার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। দেহটি অর্থহীন এবং আপনার স্বজনটি হলো দেহের আচ্ছাদনে আপনার স্বজন রূপে পরিচয় প্রদানকারি (মহান সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টি যার কোন বর্ণনা বিবরণ কোনরূপ তথ্য কারোও জানা নেই) 'আত্মা'টি।

আপনার জানা শোনা নিকট আত্মীয়গণ অনেকেই নানা ভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন। কেহ সুস্থ সবল অবস্থায় হঠাৎ যে কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, অনেকে দীর্ঘদিন শয্যাসায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

এসমস্ত লোকদের অনেকে মৃত্যুর সময় মলমূত্র ত্যাগ করে ফেলেছেন কেহ চোখ উলিটেয়ে ফেলেছেন, কেহ 'হা' করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, কেহ জিহ্বা কামড় দিয়ে কেটে ফেলেছেন, কাহারো মুখমন্ডল প্রচন্ড যন্ত্রণার প্রকাশ স্বরূপ বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করেছে। ইত্যাদি ব্যাপক পার্থক্য জনক মৃত্যু আমরা দেখতে পাই।

এসবের বাইরে কিছু কিছু মৃত্যু আমরা দেখি যাদেরকে মেরে ফেলা হয়। অনাকাঙ্খিত ভাবে হত্যা করা হয় অথবা দূর্ঘটনায় মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। কাউকে পরিকল্পনা সহকারে মেরে ফেলা হয়। যেমন কুপিয়ে, গুলি করে, কলহ করে, পিটিয়ে, ফাঁসি দিয়ে, যে সমস্ত লোককে মৃত্যুর নিকট সমর্পণ করানো হয় অথবা যাদেরকে এসবের মাধ্যমে মারা হয় তারা সকলেই বাচার জন্য চিৎকার করেন, হাউমাউ করে ক্রন্দন করেন। কেহ বাবা-মা, আল্লাহ, ভগবান ইত্যাদি

নামে চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করে ছটফট, লাফালাফি বা বাচার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা আমাদের স্বজ্ঞানে এরূপ মৃত্যু সম্পর্কে দেখেছি এবং কার্যকলাপ এবং এর ফলাফল সম্পর্কে, মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছি। নেহায়েত কষ্টকর এসব মৃত্যু আমাদেরকে চরম অমানবিক কষ্টের সম্মুখে নিক্ষেপ করে।

কাউকে হত্যা করা বা মেরে ফেলার সার বিষয়টা হলো অপ্রত্যাশিত অনাকাঙ্খিত ভাবে কাহারও দেহ থেকে 'আত্মা'কে বিচ্ছিন্ন করা, যার জন্য দেহ, আত্মা এবং সমাজ স্বজন কেহ প্রস্তুত ছিল না। এমতাবস্থায় তার সচল দেহটি থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করার/ হওয়ার চিত্রটি আমাদের নিকট মর্মান্তিক ভাবে চিত্রিত হয়। বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সে বাঁচতে পারে না। যন্ত্রণা, কষ্টে ছটফট বা লাফালাফি করা সত্ত্বেও তার দেহ থেকে আত্মাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আমাদের ধারনার বিষয়টি হলো, যখন কাউকে হত্যা করা হয় বা হঠাৎ যে কোন উপায়ে দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তিটি অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করে থাকে। তেমনি ভাবে আমরা ধারণা করি, যদি কোন মানুষ বৃদ্ধ অবস্থায় অথবা রোগাক্রান্ত অবস্থায় রোগ ভোগ করার পর মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার কোন কষ্ট হয় না (কারণ আমরা তার কষ্ট সম্পর্কে কোন ধারণা পাই না)। আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং আমাদের মানষিকতার পরিবর্তন হওয়া উচিত এবং আমাদের এসম্পর্কে গবেষণা এবং স্পষ্ট জ্ঞান লাভ/ আহরণ করা জরুরি। যেহেতু 'মৃত্যু' নামক পথের মাধ্যমে আমাকে এই পৃথিবী ত্যাগ করতেই হবে। মৃত্যু দুতের থাবা থেকে পৃথিবীর কোন প্রাণি রক্ষা পাবে না। কষ্ট ভোগ করা না করার বিষয় হলো, বাস্তব উপলব্ধির বিষয়, অনুমান বা ধারণার দ্বারা এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ বা উন্মোচিত হওয়া সম্ভব না। সুতরাং আমরা যে সমস্ত মানুষেরা এখনো মৃত্যু-বরণ করিনি যখন মৃত্যু আমার সম্মুখে আসবে আমার দেহ থেকে আত্মাকে উৎখাত করার জন্য, একমাত্র আমিই সেদিন বুঝতে পারব মৃত্যু কি জিনিস! আমরা সেদিনই যথার্থই বুঝতে পারব এবং এর কোনরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা, বিবরণের প্রয়োজন হবে না।

মুরগি, গরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা, হাতি ইত্যাদি যাবতীয় প্রাণিরা যে ভাবে কষ্টের মাধ্যমে মৃত্যু-বরণ করে অথবা তাদেরকে মৃত্যুবরণ করানোর সময় যে ভাবে কষ্ট পায়, ঠিক তেমনি আমাকে আপনাকেও আমার আপনার দেহ, শরীরের আকৃতি অনুসারে কষ্টের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

প্রাণিদের প্রাণ যে ভাবে দেহ ত্যাগ করে থাকে ঠিক তেমনি অতীব কষ্টের মাধ্যমে প্রাণ দেহ ত্যাগ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। বাহ্যিক অঙ্গ প্রতঙ্গের মাধ্যমে, আচরণের মাধ্যমে, ভাব- ভাষার মাধ্যমে অথবা অন্য-কোন উপায়ে কষ্ট ভোগ করার বিষয়টি বোঝা না গেলেও দেহটির আত্মা বিয়োগ/প্রাণ বিয়োগের সময় স্বাভাবিক কষ্ট পেতেই হবে। বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে কষ্ট বুঝা না যাওয়ার কারণ হলে অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলোর অসারতা/ বার্ধ্যক্য জনিত কারণে কর্মক্ষমতাহীনতা/ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলোর কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়া/ মেয়াদ উত্তীর্ণতা ইত্যাদি।

এসব কারনেই বার্ধক্য জনিত কারনে অথবা বিছানায় শুয়ে থাকায় অসুস্থ ব্যক্তিদের মৃত্যুবরণ করার সময়টায় আমরা কষ্ট উপলব্ধি বা কষ্ট সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করি না সবসময়। সুস্থ লোককে প্রাণ বিয়োগ করালে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ গুলো সচল থাকে বিধায় সেই মুহুর্তে সে অসীম কষ্টভোগ করে আমরা এটাই বুঝতে পারি। এই জন্য আমরা যথার্থ বোধহীন/ উদভ্রান্ত/ বিস্মৃতি পরায়ণ পাগলেরা স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা চাই।

উর্ধ্বতনদের নিকট, আন্দোলন করি, সংগ্রাম করি, সমাজের নিকট, রাষ্ট্রের নিকট, প্রার্থনা জানাই। বাঁচতেতো পারবই না তাই সাধারণ মৃত্যু, স্বাভাবিক মৃত্যু চাই, নিশ্চয়তা চাই!

কি জন্য চাই?

একটি মাত্র কারণ হলো যাহা আমরা প্রকাশ করি না। কারণটি হলো মৃত্যুর সময় কষ্ট কম হবে, কেউ দেখে কষ্ট পাবে না, কেউ বুঝবে না, কেউ দেখবে না, কেউ আমার কষ্ট পাওয়ার চিত্রটি দেখে কষ্ট পাবে না, আমাকে লজ্জিত হতে হবে না ইত্যাদির সার সংক্ষেপ। মানুষ যখন বুদ্ধিহীন হয় এভাবেই হয়। কিভাবে ভাবেন! হত্যা করা হলে কষ্ট হবে, আর শুয়ে চোখ বন্ধ করে মরলে কষ্ট হবে না? কি প্রমাণ আর কি যৌক্তিকতা আছে আপনার নিকট? আসলে আমরা সবাই জানি এবং বুঝি মৃত্যুর কষ্ট সম্পর্কে। মৃত্যুর পর পৃথিবী ত্যাগ করার পরবর্তী সময়ে আমরা সবাই চিন্তিত থাকি কিন্তু যথাযথ উপলব্ধি করি না। এই নাম মাত্র জানার পিছনে সময় ব্যয় করিনা, ভাবিনা, সন্ধানি হই না। অর্থ, বিত্ত, দুনিয়ার মোহ আমাদেরকে আত্মভোলা করে রেখেছে। পৃথিবীর কর্ম জীবনে নিমগ্ন থেকে আমরা নির্ঘাত পরিণতি সম্পর্কে উদাস থাকছি!

অথচ, জন্ম এবং মৃত্যু এই দুটিই মানব জীবনের উল্লেখযোগ্য মূল বিষয়!

এর মধ্যস্থিত সকল কিছুই ক্ষুদ্র এবং সাধারণ।

আপনার আমার শরীরে বিন্যস্ত/ বিস্তৃত/ ব্যাপৃত অবস্থায় থাকে প্রাণ বা আত্মাটি। এমতাবস্থায় আত্মা হতে আঙ্গুলকে পৃথক করতে হলে আঙ্গুলকে কাটতে হবে, আত্মা হতে হাতকে পৃথক করতে হলে হাত কাটতে হবে, আত্মা হতে পা কে পৃথক করতে হলে পা কাটতে হবে। এই পৃথকী করণে কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক।

পৃথক হওয়ার পর কর্তিত হাত বা পায়ের উপর যতই আঘাত করা হোক না কেন কোন কষ্টই অনুভূত হবে না। কারণ যেখানে প্রাণ, জীবনী শক্তি থাকে না সেখানে কোন প্রকার অনুভব শক্তি থাকে না। এবং এটাই আমাদের দেখা পৃথিবীর বাহ্যিক দেহ-আত্মার সম্পর্ক জনিত অবস্থার জ্ঞান।

আপনার স্বজনেরা অনেকে হয়ত স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন এমতাবস্থায় আপনি যদি ধারণা করেন যে, তাদের কোন কষ্ট হয়নি বা এমন স্বাভাবিক মৃত্যু হলে কোন কষ্ট হয় না, তাহলে এই ধারণা করা সর্ম্পূণ ভুল এবং বৃথা আশ্বস্থ হওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই না। তাদের শরীর বার্ধক্য অবস্থায় থাকার ফলে অঙ্গ সঞ্চালন করা, কষ্ট বুঝানোর জন্য যতটুকু ভাব ভঙ্গিমা প্রকাশ করার দরকার তার সক্ষমতা ছিল না। কণ্ঠের সক্রিয়তা ছিলনা তাই কথা বলতে পারেনি। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো বার্ধক্য জনিত কারণে স্থবির হয়ে পড়েছিল।

সুস্থলোক হঠাৎ স্ট্রোক বা উচ্চ রক্তচাপ জনিত বা অন্যকোন করণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকলে এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে দেখা যায় অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক কষ্টভোগ করতে; যদিও তারা তাদের বাক্য ব্যবহার বা অঙ্গ-প্রতঙ্গের আচরণ দ্বারা এর প্রকাশ করতে পারে না যথাযথ ভাবে। একমাত্র কারণ হলো হঠাৎ মৃত্যুর দিকে যাওয়ার কারণে নিদারুন কষ্ট এবং মৃত্যু জনিত আঘাতের কারণে সুস্থ লোকটি এবং তার সুস্থ দেহটি হঠাৎ করে স্তব্ধ বা স্থবির হয়ে যাওয়া। এসব লোক কে তার চোখ, মুখ, অস্থিরতা ইত্যাদির দ্বারা এবং অন্যান্য কিছু ক্রিয়া কলাপের দ্বারা দুঃসহ যন্ত্রণার সামান্য প্রকাশ আমরা দেখতে পাই বা বুঝতে পারি।

আমাদের উল্লসিত এবং আনন্দিত জীবনে মগ্ন থেকে আগত কঠিন বাস্তবতা ‘মৃত্যুকে’ ভুলে যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

একমাত্র নির্বোধ প্রাণি-সম মানুষেরাই মৃত্যু সম্পর্কে উদাস থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা শিক্ষা নিতে পারি সে সমস্ত পশুদের হতে, যাদেরকে সারিবদ্ধ করে রাখা হয় এবং এক একটি করে জবাই করা হয়। অন্য পশুগুলো

দেখা সত্ত্বেও মহা নিশ্চিন্তে জাবর কাটতে বা খেতে থাকে। 'আল্লাহ' এমন সুদর্শন মাংসল প্রাণিদেরকে নির্বোধ করে পাঠিয়েছেন বিধায়, অন্যথায় আমরা তাদের কবল থেকে রক্ষা পেতাম না! অতীব অনুতাপের বিষয় হলো আজ আমরা মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যুকালে উপস্থিত হচ্ছি, শেষ-কৃত্য সমাধা করছি কিন্তু ঠিক পশুর মতোই ভাবনা চিন্তা পরিহার করে মগ্ন রয়েছি নিজেদের স্বপ্নে নিজেদের মত করে।

অথচ যে কোন সময়, যে কোন মুহুর্তে, যে কোন উপায়ে, আমার দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

▶▶ আত্মার পুনরায় ফিরে আসা সম্পর্কে কোন কোন ধর্মে বিশ্বাস করা হয়। এটা সম্পূর্ণ অযোক্তিক এবং স্রষ্টার ইচ্ছার প্রতিফলন যোগ্য কোন কাজ নয় এবং এটা স্রষ্টার পক্ষে সংগত কাজ হতে পারে না।

কিছু কিছু ধর্মের অনুসারী ব্যক্তিদের, কিছু অংশের বিশ্বাসের সারাংশ এরূপ, পৃথিবীর এই জীবনে যদি কেউ ভাল কাজ করে তাহলে তাকে পূনরায় পৃথিবীতে ভাল কোন স্থানে, ভাল মানুষ করে পাঠানো হয়।

কোন ব্যক্তি যদি মন্দ কাজ করে তাহলে তাকে বিভিন্ন প্রাণি রূপ বা মন্দ কোন মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে পূনরায় পাঠানো হয়। ইত্যাদি মতবাদে অনেকেই বিশ্বাস করে থাকেন। এমনকি একত্ত্ববাদের কিছু ধর্মানুসারী ব্যক্তিও এরূপ বিশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। কিছু ধর্মে আত্মাদের পূনরায় ফিরে আসা বা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার বিষয়টি বিশ্বাস করা হয়। যারা এখন ভালো মানুষ তারা পূর্ব জনমেও ভাল কাজ করেছিলেন যারা এখন মন্দ মানুষ তারা পূর্ব জনমে মন্দ কাজ করেছিলেন বা যারা এখন পশু বা অন্যান্য ইতর/ নিকৃষ্ট প্রাণি তারা বা তাদের একাংশ একসময় অতি জঘণ্য কাজ করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনেকে বিশ্বাস করেন জঘণ্য পাপি মানুষেরা পৃথিবী ত্যাগ করার পরে বিভিন্ন প্রকার ভুত, পেত্নী বা বিভিন্ন প্রকার অশরিরী প্রাণিরূপ বা আত্মারূপে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসে এবং মানুষের পরিবেশ থেকে দূরে প্রকৃতিক পরিবেশে বসবাস করে থাকে। তাদেরকে বিরক্ত করা হলে বা ভক্তি করা হলে তারা মানুষদের ক্ষতি সাধন বা উপকার সাধন করে থাকে বা তারা উপকার বা অনিষ্ট সাধন করতে সক্ষম। এজন্য অনেক মানুষেরা তাদেরকে তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন প্রকার পূজা, নৃত্যগীত, বন্দনা, ভক্তি করে থাকেন, অনুষ্ঠান করে থাকেন। এরূপ

বিশ্বাসিদের নিকট তাদের বক্তব্যের সপক্ষে অসংখ্য কাহিনী বা গল্পের প্রমাণপত্র এবং ইতিহাসের উদ্বৃতি বিদ্যমান রয়েছে।

এসব বিভ্রান্তি মূলক কথা, বর্ণনা, ধারনা যদি সত্য হয় তাহলে মনে করুন বর্তমানে পৃথিবীতে ৭শত কোটি মানুষ আছে যারা পূর্বেও মানুষ ছিলেন। বর্তমানে যদি ২ লক্ষ কোটি অন্যান্য প্রাণি থাকে তাহলে পূর্বে সমপরিমাণ ২ লক্ষ কোটি পরিমাণ মানুষেরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন! এটা কিভাবে সম্ভব?

অথচ আমরা দেখছি যে, মানুষদের বর্তমান সংখ্যাটা পূর্বে কখনই ছিল না বরং মানুষদের সংখ্যা পূর্বে কম ছিল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে হতেই বর্তমান অবস্থায় এসেছে। পূর্বের মানুষ বা প্রাণিদের ফিরে আসাটা যদি সত্য হয় তাহলে বর্তমানে যে মানুষদের সংখ্যাটা আছে তা পূর্বেও থাকত এবং আমরা এই বিশাল জনগোষ্ঠির মানুষ/ প্রাণিদেরকে দেখতাম না। এরূপ বিশ্বাসি ব্যক্তিরা যদি মনে করেন পূর্বের মানুষদের আত্মা এবং নতুন সৃজিত আত্মার সম্মিলনে পৃথিবীর মানুষ ও প্রাণিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এরূপ ভাবনা বিশ্বাসীদের বক্তব্যের স্বপক্ষে আমাদের ভাবতে হবে কোন আত্মা পূনরায় আসছে এবং কোন আত্মা নতুন সৃজিত হয়ে আসছে! এই তথ্য কি আমাদের কারো কাছে আছে?

যদি মনে করুন সবাই ফিরে আসে এবং নতুন করে আত্মা সৃজিত হয় তাহলে আমাদের যে বিষয়টি অজানা থাকছে, তাহলো দুর্বোধ্য একটা বিষয়- "নতুন সৃজিত এবং পূনরায় প্রেরিত আত্মাদের পরিচয়"।

আমরা একটা আলোচনায় আসতে পারি যেমন ঃ

১. পশু-পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে কিছু মানুষের আত্মা পৃথিবীতে পূনর্বার পেরিত হয় এবং কিছু মানুষের আত্মা ভালো কর্ম সম্পাদন করার কারণে পৃথিবীতে পূনরায় পেরিত হয় ভালো মানুষ রূপে। এমতাবস্থায় পূনরায় প্রেরিত হয়ে আসার পর মানুষটি যদি অন্যায় কর্ম করে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাকে আবার ফিরে আসতে হয় পশু-পাখি রূপে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো মানুষ, ভালো-মানুষ হয়ে পৃথিবীতে পুণরায় আসার পরও মন্দ কর্ম করার কারণে পশুত্বে পরিণত হয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। যদি কেহ মন্দ কর্ম করে তাহলে পশু হয়ে প্রত্যাবর্তীত হওয়ার ফলে পুণরায় আসার সুযোগ শেষ হয়ে যায়। সারমর্ম অনুধাবন করা যায় এই ভাবে যে, পৃথিবীই মূল লক্ষ্য এবং মানুষের মূল উপজীব্য বিষয়। পৃথিবীর ভোগ উল্লাস, আনন্দ ইত্যাদিই মানুষের জন্য মহান স্রষ্টার অসীম দান। ভালো হতে পারলে

পৃথিবীতে বার বার আসা যাবে এবং পৃথিবীতে বসবাস করে দেহের মাধ্যমে 'আত্মা' বার বার তৃপ্তিবোধ করবে, পৃথিবীর আনন্দ উল্লাসে জীবনকে সার্থক করবে! অথচ পৃথিবীতে আনন্দ ভোগ উল্লাস এবং মানুষের পৃথিবী সম্পর্কিয় যাবতীয় অর্জন বলতে যা কিছু বুঝায় বা বুঝে থাকি অথবা যা কিছু সম্ভব অধিকাংশ কিছুই অন্যায় অমানবিকতা এবং অসত্য জীবনাচারের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে! এটা কি প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় নয়?
এসব মতাদর্শ কি পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে না!

২. অন্যান্য প্রাণি/ পশু-পাখিরা নিকৃষ্ট! মনে হয় মহান স্রষ্টা পৃথিবীর মানুষ ব্যতীত সমস্ত পশু-পাখিদেরকে নিকৃষ্ট করে পাঠিয়েছেন।
এসব ভাবনা কতটা সঠিক হতে পারে?
অথচ পৃথিবীতে বসবাসকারী সমুদয় নিরীহ প্রাণিরা মানুষের নানা প্রয়োজনে, নানা উপলক্ষ্যে, নানা কল্যাণে, নানারকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কল্যাণে কাজ করছে এবং অবশেষে পৃথিবী থেকে নিঃশেষিত হচ্ছে। এমন নিষ্পাপ প্রাণিরা কখনোই নিকৃষ্ট হতে পারে না। যারা এমন মতবাদে বিশ্বাস করেন এবং যাহারা এসমস্ত মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন রকম মিডিয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রচার প্রচারণা করে থাকেন তারা মহান স্রষ্টা আল্লাহর অসীম সম্মানকে ক্ষুন্ন করছেন। এজন্য অবশ্যই তাদের কঠিন জিজ্ঞাসা এবং কর্মফলের সম্মুখীন হতে হবে।

৩. একজন মানুষ পৃথিবী থেকে মন্দকর্ম বা আচরণের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে চলে গেলে প্রাণিতে রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসে পূনরায় জন্মের মাধ্যমে! অথচ প্রাণিটি বুঝতে পারেনা যে, সে তার কর্ম ফলের কারণে পশুতে রূপান্তরিত হয়ে ফিরে এসেছে! এটা কেমন বিচার হলো? আমি শাস্তি ভোগ করছি অথচ আমি জানতেছি না? আইন আর সাজা উভয়ে রসাতলে যাওয়ার উপক্রম হবে এহেন বক্তব্যে!
প্রাণিরা কথা বলতে পারে না! তাই?

কথা বলতে না পারলে কি হবে? বুঝতে পারলেই যথেষ্ঠ। তারা যদি বুঝতে পারত তাহলে তো চলে আসত পূর্বের জন্মের স্বজনদের নিকট অথবা পূর্বের জন্মে সে যে স্থানে বসবাস করত এবং তার স্বজন বা হিতাকাঙ্খীরা ছিল সে তাদের নিকট পৌছানোর জন্য চেষ্টা করত। এমতাবস্থায় আমরা দেখতাম তাদের বিভিন্ন রকম কষ্টধ্বনি, চিৎকার, ছটফট আচরণ করা, চোখের পানি

পড়া অথবা উন্মাদ আচরণ দ্বারা তারা মানুষদেরকে কিছু বুঝানোর চেষ্টা করত যে আমি পূনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। এমতাবস্থায় তার স্বজন বা নিকট জনেরা বুঝতে পারত আমাদের আত্মিয় বা (অমুক বা তমুক) ব্যক্তিটি শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, শুয়োর ইত্যাদি হয়ে ফিরে এসেছে!

আপনার জানা মতে পৃথিবীতে কোথাও এরূপ কোন ঘটনা ঘটেছে কি?

৪. ভালো মানুষ ভালো কর্ম করে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই মতবাদ যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের স্বজনেরা যারা পৃথিবী ত্যাগ করে চলে গিয়েছে তাদের কেউ কি পূনরায় পৃথিবীতে এসে স্বজদের নিকট পরিচয় দিয়েছে যে আমি তোমাদের সেই স্বজন যে নতুন করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছি এই হলো আমার বর্তমান পরিচয়!

সঠিক এবং বাস্তবতা হলো, বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও এরূপ কোন ঘটনা ঘটছে না।

এসব কাহিনীর ধর্ম প্রচারকেরা নানা কাহিনী শুনান, কাহিনী তৈরি করেন, রসালো ফলের মতো রস নিংড়িয়ে ভক্তদের অথবা অনুসারীদের রস খাওয়ান। আর আমরা এসমস্ত কল্প কাহিণীতে বিশ্বাস করে বসে থাকি অথচ এসব কাহিনীর কোনই ভিত্তি নেই প্রমান নেই এবং প্রমান যোগ্য কোন গ্রন্থও নেই!

আমি পূন্য করলাম নতুন করে জন্ম নিলাম এভাবে আসতেই লাগলাম কিন্তু আমি জানলাম না। কেমন হলো বিষয়টি? আমি ক্ষেত মুজুরের কাজ করি কিন্তু জানিনা আমার একাউন্টে প্রধান মন্ত্রী ৫০ কোটি টাকা দিয়েছেন! স্ত্রী/স্বামী না থাকার কারণে মহা কষ্টে রাত-দিন কাটাই অথচ সুন্দরী কোন নারী আমার স্ত্রী হয়ে অন্য কোথাও অবস্থান করছে আমি জানি না! অভাবের কারণে ক্ষুধার্ত রাত্রি কাটাই অথচ আমার জন্য কাশ্মিরী বিরিয়ানী তৈরি করে রাখা আছে কিন্তু আমি জানি না। এমতাবস্থায় আমার টাকা, আমার স্ত্রী আর বিরিয়ানী এসবের কি কোন মূল্য আছে? যেহেতু উপকারে আসছে না সেই বস্তুগুলো থাকা না থাকার চেয়েও বেদনা দায়ক!

৫. আত্মঘাতী বা হত্যাকৃত বা জঘণ্য পাপি ব্যক্তিদের বিভিন্ন অশরীরি প্রাণিরূপ বা আত্মা রূপে ফিরে আসার বিষয়টি নিয়ে বা ভুত পেত্নী রূপে ফিরে আসার কল্প কাহিনীগুলো অতীতের প্রমাণ পত্র হিসেবে বার বার আলোচিত হচ্ছে; মানুষদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য। অথচ এরূপ কোন কাহিনী পৃথিবীর কোন স্থানে বাস্তবিক ভাবে সংগঠিত হচ্ছে না কেন?

বর্তমানে ভুত পেত্নীদের নানা কল্পকাহিনী বা আত্মাদের পুনরায় ফিরে আসার কাহিনী সম্পর্কে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং আকর্ষিত করা হচ্ছে যার বিন্দুমাত্র কোন প্রকার বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিক, বিশ্বাসযোগ্য ধর্মীয় ভিত্তি নেই। শুধুমাত্র ব্যবসা এবং নৈতিকতা বির্বজিত শয়তানী ধুম্রজাল সৃষ্টিই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। তারা এর মাধ্যমে শিশু নারী এবং অজ্ঞদের মন মগজ শয়তানী বিষে দগ্ধ করছেন, সত্য বিমুখ হয়ে!

এসব মিডিয়াগুলো কিভাবে আমাদের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ধ্বংশ করছে আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি? দূর্ভোগ আমাদের! ধিক! ধিক! ধিক!

মহান স্রষ্টা আল্লাহ পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণি প্রকৃতি এবং বৈচিত্র পূর্ণ নানান প্রতিবেশ পরিবেশ দ্বারা মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে পৃথিবীকে সু-সজ্জিত করেছেন। মহা নভো-মন্ডলের বিশাল একটা অংশ মানুষের দৃষ্টিতে রেখেছেন। এত সুন্দরতম মহান ক্ষমতাধর স্রষ্টার সৃষ্টি-শৈলি, নানা প্রকার আয়োজন! কি জন্য?

মানুষকে বিড়াল, কুকুর, গাধা, শিয়াল এসবে পরিণত করার জন্য?

মানুষকে ভুত পেত্নী বা অন্যান্য আজগুবি কল্পকাহিনীর উপলক্ষ্য হিসেবে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠানোর কোন উদ্দেশ্য মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষে সঙ্গত হতে পারে না এবং কখনোই হতে পারে না এবং কখনোই না।

তিনি মানুষের কষ্টার্জিত সৎ কর্ম, স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য অনুগত অবনত হওয়া এবং শয়তানের প্রতি কঠোর বিরোধিতাকারী মানুষদেরকে যথার্থ পুরস্কৃত করবেন এবং এবং দুনিয়ার ভোগ, লালসা এবং ইন্দ্রিয়ের প্রতি নিরাসক্ত শুদ্ধ-আত্মাদের, আত্মাধারী মানুষদের উত্তম প্রতিদান/ পুরস্কার হিসেবে মহান সত্তার সন্নিকটে জান্নাতে চিরস্থায়ী ভাবে মহা-অনুগ্রহে সম্মানিত করবেন। আসুন আমরা এসব ভ্রান্ত মতবাদের ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসি এবং বিনীত হই মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি! যেন তিনি আমাদেরকে সঠিক সত্য সঙ্গত ভাবনায় নিয়োজিত করেন এবং নানা প্রকার অন্যায় এবং আত্মবিধ্বংসী ধুমায়িত ধুম্রজাল থেকে রক্ষা করেন!

▶▶ পৃথিবীতে কিছু কিছু বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা রকম বক্তব্য উপস্থাপন করে প্রাণি বিজ্ঞানী হিসাবে নাম যশ কুড়িয়েছেন। কেহ বলেছেন মহা বিস্ফোরণ থেকে পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির উপকরণ এসেছে তারপর পরবর্তীতে নানা ভাবে এক প্রকার মানুষের উৎপত্তি ঘটেছে এবং বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান মানুষদের রূপ আমরা দেখছি।

তাদের বক্তব্য প্রাণিদের উৎপত্তি সম্পূর্ণ ভাবে/ একবারে হয়নি। বিবর্তনবাদের ব্যাখাগুলো পৃথিবীর অনেক মানুষই বিশ্বাস করে থাকেন কারণ সহজ ব্যাখ্যায় সহজ বর্ণনা! শুনলাম পাঠ করলাম, বিশ্বাস করলাম, হতে পারে, মেনে নিলাম; ইত্যাদি। এই হলো আমাদের মানুষদের অবস্থা। কিন্তু বিশ মিনিট সময় নিয়ে আমরা কখনো কি এসব বিষয় ভেবেছি? কখনই না। সময় নেই, ভাববো কখন?

ডারউইন মতবাদ দিয়েছিল, বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি। বানর বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যান্য প্রাণি সমূহ বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপে উপনীত হয়েছে। একটি প্রাণির সঙ্গে অন্য প্রাণির সাদৃশ্য তাকে তার মতের স্বপক্ষে বিশ্বাস জমিয়েছে! এই মতবাদে বিশ্বাসী লোকের অভাব ছিলনা সেই সময়।

এখনো এই মতবাদে বিশ্বাস করে অনেক মানুষেরা। বিবর্তনবাদের এই মতবাদের কারনেও কিছু মুর্খ লোক মহান স্রষ্টার প্রতি আত্মসন্ধানি না হয়ে নানা রূপ কল্পনা আজগুবী বিবর্তন, সাদৃশ্যের প্রচারনায় বিশ্বাসী হয়ে মহান স্রষ্টার পথের উল্টো দিকে আপন বোধশক্তি ব্যয় করছে।

কিন্তু সেই ডারউইন এর সময় হতে অদ্য পর্যন্ত কোন প্রাণিকে দেখলাম না অন্য একটি প্রাণিতে পরিণত হতে, কোন বানর মানুষে পরিণত হলো না, না হলো জঙ্গলে, না হলো কোন চিড়িয়াখানায়, না হলো কোন গবেষণাগারে! বিবর্তবাদীদের মতে বিবর্তনবাদ বর্তমান সমস্ত সৃষ্টির মূল প্রক্রিয়া বা বিবর্তনের মাধ্যমে নানা প্রতিকূল অনুকূল পরিবেশের মাধ্যমে পৃথিবী এবং অন্যান্য সৃষ্টি এবং মানুষের পরিণত রূপ এসেছে। যদি এই পৃথিবী পরিবেশ প্রকৃতি এবং প্রাণি সমাজ ও মানুষদের রূপ হয়ে থাকে তাহলে মানুষদের দেখা, জানা ও চেনা দেড় থেকে ২ হাজার বছর হতে কোন প্রাণি, কোন সৃষ্টি বিবর্তিত/ আংশিক বিবর্তিত হলো না কেন?

বানরের বিবর্তিনের প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে যদি বর্তমান সভ্য মানুষদের রূপ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এই মানুষেরা ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হয়ে অন্যকোন আকৃতি প্রকৃতি বা অন্য কোন জীবে বা মানুষের চেয়েও উন্নত কোন শ্রেণিতে রূপান্তরিত হবে! কিন্তু দুই বা তিন হাজার বছরের মধ্যে কোথাও কি এমন কিছু ঘটেছে? অতীত ইতিহাস, বর্তমান ঘেটে আমরা কি কিছু জেনেছি? অথবা, বিকৃত মস্তিষ্কবাদীদের জিজ্ঞেস করতে চাই, সময় সল্পতা হেতু যদি কোন প্রমান উপস্থাপন না করার উত্তরটি আপনার হয় তাহলে গবেষনা করে বিশ্ববাসীকে

জানিয়ে রাখুন! মানুষ বিবর্তিত হয়ে কিসে রূপান্তরিত হবে এবং অন্যান্য কিছু প্রাণিদের রূপান্তরিত হওয়ার ভবিষ্যতব্য রূপ প্রকাশ করুন!

আমাদেরকে এসব কল্পনা প্রসুত মোটা মস্তিষ্কের বক্তব্য ভাবনা গুলো সম্পর্কে বাস্তবিক অর্থে (গ্রহণযোগ্যতা) চিন্তা করা উচিত।

প্রকৃত কথা হলো, মানুষদের একটা দলকে 'আল্লাহ' বানরে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। তবে সেখান থেকেই বানরের উৎপত্তি হয়নি। বানর নামক একটা প্রাণি পূর্ব থেকেই ছিল তার মধ্যে একটা শ্রেণী যুক্ত হয়েছে যারা ছিল মানুষ। মানুষ বানর নিয়ে যোগ সূত্র এটুকুই।

বর্তমানের বিজ্ঞানীরা কি বলছেন?

তারা বলছেন সমস্ত মানুষদের উৎপত্তি একজন মানুষ হতে। আদি মানুষ হতে সমস্ত মানুষেরা জন্ম গ্রহণ করেছেন এটা মহা প্রমানিত।

প্রধান প্রধান সকল ধর্মের কথারই প্রতিধ্বনি করছে আমাদের বর্তমানের বিজ্ঞান। ধার্মিক ব্যক্তিরা যখন বিবর্তনবাদীদের বিরুদ্ধে আচরণ করিয়াছিল/ গলা উঠিয়েছিল, বর্তমানের বিজ্ঞান তাদেরকে বাহবা না দিলেও চুপ রয়েছে!

প্রকৃত কথা হচ্ছে, পৃথিবীর সকল সাদৃশ্যপূর্ণ প্রাণিকে 'আল্লাহ' সাদৃশ্যজনক ভাবেই সৃষ্টি করেছেন। একটি প্রাণি থেকে অন্যটি, একটির মাধ্যমে একাধিক প্রজাতি অথবা নানারকম মাধ্যমে ব্যাপক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণিদেরকে যথোপযুক্ত আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন; যার প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহর নিকটই রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে বিবর্তিত হয়ে মহান স্রষ্টার ইচ্ছা বর্হিভুত কোন প্রান বা প্রাণির সৃষ্টি কখনোই হয়নি।

আমাদের আধুনিক জীবনে ধর্ম

আমরা প্রতিটি মানুষ এই পৃথিবীতে যে সময়টা অতিবাহিত করছি তা প্রত্যেকের জন্য মোটেই সুখকর নয়, আনন্দের নয়। আমাদের অধিকাংশ মানুষ এই পৃথিবীর বুকে বেচে থাকার লক্ষ্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করছি, ক্রমাগত শ্রম দিয়ে যাচ্ছি, চরম অনিশ্চিত এবং নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কর্মে প্রবৃত্ত থেকে হলেও খাদ্য বস্ত্র এবং বাসস্থানের স্বপ্ন দেখছি। এরপর আরও কিছু প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট থাকছি সবসময়।

ব্যতিক্রম হিসেবেও অসংখ্য মানুষ আছেন যারা পৈত্রিক সূত্রে বিশাল/ প্রয়োজনীয় সম্পদ লাভ করে জীবনকে নানা সম্ভারে পূর্ণতার মাধ্যমে উপভোগ করছেন। হাসি, আনন্দ আর ভোগের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত থেকে জীবনকে অতিবাহিত করছেন। অসংখ্য লোক এমন আছেন যারা তাদের সম্পদ জ্ঞান, বুদ্ধি কৌশলগত চিন্তা ভাবনা খাটিয়ে মিথ্যা অহমিকা মিশ্রিত ক্ষমতা এবং সম্পদের ব্যাবহার করে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব করছেন, শোষন করছেন, সৎ অথবা অসৎ উপায়ে। অসংখ্য লোক অসংখ্য উপায়ে, অসৎ/ মিথ্যার আশ্রয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন।

এক শ্রেণীর লোকজন নিষ্পেষিত হচ্ছেন, দিন দিন আর্থিক ভাবে শুষ্ক হচ্ছেন। শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বাড়ছে এবং ভূমিহীন নিষ্পেষিতরা যাযাবরের মত জীবন যাপন করছেন। শ্রমিক, যাযাবর, নিষ্পেষিত দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা যেখানে যায়, যে অবস্থায় থাকে এরাই শোষিত বঞ্চিত এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নির্যাতনের শিকার হয়। মিথ্যাবাদীদের প্রতারণায়, মিথ্যা প্রচারনায়, আশ্বাষে প্রলুব্ধ হয়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ আজ ক্রমাগত শ্রমস্বীকার করে যাচ্ছেন প্রকারান্তরে নব্য কৃতদাসের জীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। নব্য আধুনিক জীবনে আমাদের মধ্যে মালিক ও শ্রমিক দুটি শ্রেণির সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীতে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমাগতই। যদিও গড় অর্জন উন্নতি অগ্রগতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা যতই আধুনিক জীবনে প্রবৃত্ত হচ্ছি, অগ্রসর হচ্ছি, আমাদের জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্র ততই সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং জটিল থেকে জটিলতর পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে।

আমরা আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের কল্যাণে ব্যাপক বৈচিত্রপূর্ণ কর্ম জীবনের সন্ধান পেয়েছি এবং পিপিলিকার দলের মতো এসব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছি এবং বের হচ্ছি। বিনিময়ে যা পাচ্ছি তার দ্বারা অনেকের প্রয়োজন পূর্ণ হচ্ছে এবং অধিকাংশ মানুষেরই ন্যূনতম প্রয়োজনও পূর্ণ হচ্ছে না। যাদের প্রয়োজন পূর্ণ হচ্ছে তারা অনেকেই দ্রুত উচ্চ শ্রেণীর জনগোষ্টিতে রূপান্তরিত হচ্ছেন এবং সামগ্রিক ভাবে সংখ্যাগুরু মানুষদের জীবনের দুর্দশা বাড়ছে বৈ কমছে না। পাশাপাশি কর্ম জীবনের বৈচিত্রতা এবং ব্যাপকতায় মানুষের জীবনে যান্ত্রিকতা ক্রমাগতই বাড়ছে। মানুষ আজ মানুষের মতো আচরণ করছে না। এমনকি সে তার স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছে, অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে যন্ত্রের মতো আচরণ করছে। মানুষকে যে কারণে মহান সৃষ্টিকর্তা 'মানুষ' হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, দেহ+আত্মা এই দুয়ের সম্মিলন ঘটিয়েছেন, তাহার যথার্থ প্রকাশ মানুষের দ্বারা হচ্ছে না। এমন কি সম্ভাব্যতাও কমে যাচ্ছে।

মানুষের মানবিকতা, সহনশীলতা, পর-মতসহিষ্ণুতা, নৈতিকতা, সামাজিকতা সবকিছুই আজ শুন্যের কোটায় দাড়িয়েছে! মনুষ্যত্ববোধকে ছাপিয়ে আজ মনুষ্যত্ববোধ বর্হিভূত কার্যকলাপ গ্রাস করেছে মানব সমাজকে। সবকিছুর মূলে একটি বিষয় আজ মানুষদেরকে অমানুষে পরিণত করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। সেটি হলো জীবন ধারণের জন্য 'অর্থ'কে বড় করে দেখা। অর্থ উপার্জন, বিত্ত বৈভব আর মিথ্যা অহমিকা পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশ করে দাম্ভিকতার সহিত বসবাস করে ইজ্জত সম্মান লাভ করার মানষিকতা মানুষকে উদভ্রান্ততায় নিমজ্জিত করছে। অথচ মানুষের প্রত্যাশিত সম্মান বলতে যা কিছু বোঝানো উচিত ছিল বর্তমানে তার উল্টোটা বুঝা হয়। এবং এরই প্রত্যাশা করা হয়।

অর্থ দ্বারা বিত্তবান হওয়া, অন্যের চেয়ে উচ্চ ভাবে বসবাস, চলাচল, মানুষদের নিকট নিজের বড়ত্ব জাহির করা, যেন অন্যসব মানুষদের নিকট বড় হওয়া যায় এবং মানুষেরা যেন বাধ্য হয়, অনুগত হয়; এসবের প্রয়োজনে অর্থের মাধ্যমে সমাজের উচ্চস্থানে আসিন হওয়াই লক্ষ্য। এমতাবস্থায় অর্থ আর ক্ষমতা এই দুটোর পিছনে বিশেষত 'অর্থে'র পিছনে প্রতিটি মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছে। মিথ্যা বলা, প্রতারনা করা, উৎকোচ প্রদান করে স্বার্থ সিদ্ধি করা, অন্যের সম্পদ ভোগ করা, সুদ, দূর্নীতির মাধ্যমে অর্থের উপার্জন, জোর পূর্বক অন্যের সম্পদ হরন,

যৌনতা নির্ভর উপার্জন, নগ্নতার বানিজ্যিকরণ, ইত্যাদি শত রকমের অবৈধ পথের সৃষ্টি হয়েছে যার দ্বারা মূলত অর্থ উপার্জনকেই মূল বিষয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এসব পথে অর্থ উপার্জনকারী মানুষেরা রীতিমত প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হচ্ছেন এবং মূল্যবান জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মৃত্যুর ঝুকি নিতেও পিছু হচ্ছেন না। চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেও চলছে আমাদের অধিকাংশ মানুষদের জীবন-যন্ত্র, এরপরও আমরা প্রতিনিয়ত সুখের প্রত্যাশা করছি এবং ছুটে চলছি। আমাদের কর্মক্ষেত্রগুলো কত ঝুকিপূর্ণ, কত ত্রুটিপূর্ণ, অমানবিক, জীবন-বিরোধী তা আমরা অনুধাবন করি না বিধায় বুঝিনা। দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য, কেহ শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য। এই যে এতো পরিশ্রম, এত ত্যাগ, এত হাহাকার, সত্যিকার সফলতা কি পাবো আমরা?

কেন আমরা আমাদের স্বরূপ থেকে সরে এসেছি? কেন আমরা শুধু অর্থের পিছনে দৌড়াচ্ছি?

আমাদের জীবনে অর্থ/ টাকা কেন প্রভূর ন্যায় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে?

এতকিছুর পরও আমরা ভাবি বিষন্নভাবে, উদাসভাবে কেননা অর্থের পিছনে আমরা যতই দৌড়াইনা কেন আমাদের মনে চেপে আছে ধর্মের চিন্তাভাবনা। ধর্মের বাহিরে আমরা যতই থাকিনা কেন (ধর্মের তুলনাই আমরা কত দূরে আছি সেটা অবশ্যই অনুধাবনের বিষয়) ধর্মের কথা দিনে একবার হলেও স্বরণ হয়, স্বরণ হয় আমরা ধর্ম বিমুখ জীবন যাপন করছি এবং যে কোন সময় পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যেতে হবে!

আমরা তো ধর্মের বিধানাবলী পালন করছি না! ধর্ম বিরোধী অন্যায় কর্মে লিপ্ত রয়েছি! ইত্যাদি ভাবনা আমাদেরকে বার বার দংশন করে। ধর্মের প্রতি আমাদের অকৃত্তিম ন্যূনতম ভালোবাসার কারণেই এসব ভাবনার প্রকাশ ঘটে থাকে। আমাদের মধ্যে অসংখ্য ধর্মের বিরোধের কারণে অসংখ্য মানুষেরা সন্দিহান এজন্য যে, আমরা যে ধর্মের অনুসরণ করছি তা আমাদেরকে মৃত্যুর পর যথার্থই স্বার্থক করবে কিনা! অথবা যথার্থই আমাদেরকে বাচাতে পারবে কিনা! অথবা সত্যিকার অর্থে ধর্মে যা বলা হচ্ছে তা বাস্তবতায় রূপ নিবে কিনা! আমাদের মধ্যে অসংখ্য মানুষেরা এসব ভাবনার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ডুবে থাকেন।

ধর্ম নিয়ে ভাবা, গবেষনা করার মতো পর্যাপ্ত সময় আমাদের হয়ে উঠে না। ধর্মের অনুশাসন মানার মতো প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সময় এবং জীবনবোধ গড়ে তোলার মতো সদিচ্ছা এবং চেতনা আমাদের মধ্যে কাজ করে না। এছাড়া আমাদের আধুনিক জীবনের ব্যাপক বৈচিত্রময় কর্মগুলো আমাদেরকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ধর্ম থেকে দূরে রাখে, ধর্মের বিধান পালনের সময় পাওয়া যায় না, ধর্মের অনুশাসন বা সমাজবোধ প্রায়ই আধুনিকতা বিরোধী হিসাবে চিত্রিত হয়। এমতাবস্থায় আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অন্ত:সার শুন্য হাহাকার, ভয়, চাপা-কষ্ট কাজ করে। কেননা আমাদেরকে একদিন এই মোহময় পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ জীবনের পথে; মহা বিপদ সঙ্কুল কষ্টকর মৃত্যুর মাধ্যমে। এজন্য আমরা শেষ বয়সে হলেও যেন ধার্মিক ব্যক্তি হয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারি এবং ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী ত্যাগ করতে পারি এই প্রত্যাশা করি; পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের প্রায় প্রতিটি মানুষ।

ধর্মীয় ভাবনায় আমরা কষ্ট পাই, মৃত্যু এবং পরবর্তী সময়ের ভাবনায় ভয় পাই, পারিবারিক, ব্যক্তিগত ভাবনায় কষ্ট পাই, আর্থিক বিষয়ের দিকে তাকালে নিজেকে হীন এবং অসহায় মনে করি, সামাজিক অবস্থানের দিকে তাকালে অন্যের তুলনায় নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং আধুনিকতার এত ভোগ উল্লাস এবং জীবনবোধের এত বৈচিত্রতার মধ্যেও আমরা আমাদের সত্যিকার ভবিষ্যত উপলব্ধি করতে সক্ষম হই এবং এর বাস্তবতা আমাদেরকে কষ্ট দেয়। আমাদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ আবার ধর্মগুলোর মধ্যে একাধিক কোন্দল মতবাদ বা পথ রয়েছে।

কোন কোন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ এবং মতপার্থক্য এতবেশি যে, সামগ্রিক ভাবে উক্ত মতভেদ/ দলাদলী ধর্মটির জন্য মহা সমস্যা হিসাবে দাড়ায়। যার ফলে সেই ধর্মটির প্রতি আকর্ষণ অনুভবকারী ব্যক্তিগুলো ধর্মানুসারীদের মধ্যে দল, উপদল দেখে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। এবং সেই নিজ ধর্মানুসারীদেরও একটি অংশ এবং বেশিরভাগ অংশই ক্রমান্বয়ে ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি, সর্বোপরি ধর্মের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করে মূলত ধর্ম থেকে নিজেদের অজ্ঞতাসারেই ধর্মহীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে যত প্রকার দল উপদল রয়েছে পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে তা নেই। আমরা মানুষেরা এমনিতেই ধর্ম থেকে বিমুখ এবং বিজ্ঞান,

আধুনিক জীবনবোধ আমাদেরকে ধর্ম থেকে উল্টোপথে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের সামাজিক যে গতি প্রবাহ তা কোন ভাবেই ধর্মের সহিত একাত্ত্বতা পোষন করে না। মুসলমানদের কে এসব বিষয় নিয়ে ভাবা উচিত যদি আমরা মুসলমান হিসাবে দাবি করি।

আমাদের এই পৃথিবীতে শত শত কোটি ধর্মানুসারী, ধর্মপ্রাণ, ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের মধ্যেও কিছু মানুষ আছেন যারা কোন ধর্মে বিশ্বাসবোধ প্রকাশ করতে লজ্জা পান, স্রষ্টায় অস্বীকার করেন। এরা সেই সমস্ত মানুষ যারা ধর্মের বিরুদ্ধে বলেন এবং নিজেদেরকে ধর্মহীন আলাদা স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা শ্রেণি হিসেবে বিশেষত স্রষ্টায় অবিশ্বাসী 'নাস্তিক' হিসাবে পরিচয় প্রদান করেন বা প্রকাশ করেন বা প্রকাশিত হন।

তারা সভ্যসমাজের প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষিত, সভ্যমানুষের প্রতিনিধি হতে চায় এবং মুক্তমনা উদার দৃষ্টি ভঙ্গি লালনকারী হিসেবে পরিচয় প্রদান করে ধর্মের বিধানের বিরোধীতা করে থাকে। তারা বিভিন্ন প্রকার মনগড়া উক্তির মাধ্যমে ধর্মের এক বা একাধিক বিধি বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে এটাকে বাক স্বাধীনতা হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। এই সমস্ত নাস্তিক বা স্রষ্টায় অবিশ্বাসী বা ধর্মবিরোধী মানুষেরা এতটা অন্ধ, এত বিবেকবোধহীন যে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের এত আয়োজনের মধ্যে, শিল্প–প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার প্রমাণ স্বরূপ "স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রকাশ" দেখতে পায় না।

এরা তাদের জীবনকে এমন পথে ব্যয় করছে যার নগণ্যতার/ মূল্যহীনতার কোন উদাহরণই দেওয়া সম্ভব নয়। তারা মহাবিশ্বের নানা বিস্ময় নিয়ে গবেষণা করে, বিজ্ঞান মনস্কতায় উদভ্রান্ত, আধুনিক জীবন বোধের বুলি আওড়ায়! এরা মহা-বিশ্বের মালিকানা স্বীকার করে না। তারা খাবার খায় কিন্তু এই খাবারের মালিক বা স্রষ্টা আছেন তা বিশ্বাস করে না। এত সৃষ্টি, এত প্রাণ, এত আয়োজন! কিন্তু তাদের মতে এর কোন মালিক বা স্রষ্টা নেই। পৃথিবীতে প্রাণ ও প্রাণিদের এত সুশৃংঙ্খল গতি প্রবাহ কি কোন স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক ছাড়াই?

আসলে তারা ধর্মের বিরোধীতা করলেও ধর্মের মধ্যেই বসবাস করে ধর্মের প্রকাশ করে তার নিজের দ্বারা; কিন্তু তারা এতটা মুর্খ যে তা বুঝতে পারে না। পৃথিবীতে সাতশ কোটি মানুষের আঙ্গুলের ছাপ সাতশ কোটি রকমের। কারোও

সাথে কারও সাদৃশ্য নেই। স্থবির জড় বা বিবর্তন ক্রিয়ার মাধ্যমে এমন প্রাণের সৃষ্টি হলে বা একাধিক স্রষ্টা হলে এমন স্বাতন্ত্র অসম্ভব!

মহান স্রষ্টার আপন সৃষ্টি কৌশল ব্যতীত বিবর্তন বা হঠাৎ অথবা প্রাকৃতিক অন্যান্য প্রক্রিয়ায় (সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা ব্যতীত) প্রাণের সৃষ্টি হলে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণিদের পৃথিবীস্থিত এমন সুন্দর সু-শৃংঙ্খল চিত্র, গঠন শৈলী, সৃষ্টি জীবন ও সমাজ আমরা দেখতাম না।

পৃথিবীর কোন মানুষের হার্ট বা হৃদয় বুকের বাম দিকে না হয়ে ডান দিকে হলো না! পৃথিবীর কোন মানুষের যৌনাঙ্গ পশ্চাতদিকে হলো না!

চক্ষু দুইটির স্থানে তিনটি হলো না!

মুখের জিহ্বা দুপার্শ্বের দাতকে কখনোই অতিক্রম করে না!

মানুষদের জিহ্বা দ্বারা টক, মিষ্টি, ঝাল ইত্যাদি স্বাদ গ্রহণ করার ধরন একই রকমের। বিবর্তনই যদি হতো বা অন্যান্য ভাবেই যদি মানুষের সৃষ্টি হতো তাহলো স্বাদ গন্ধ চিহ্নিত করার ক্ষমতা বিহীন জিহ্বা আমরা দেখতাম কিন্তু ৭শত কোটি মানুষের মধ্যে ৭শত মানুষও কি আছে, ব্যতিক্রমী হিসাবে?

মুখ হতে পায়ু পথ, এর মধ্যস্থিত যাবতীয় কর্মপন্থা সমস্ত মানুষ এবং প্রাণিদের একইরকম। খাবার খাওয়ার পরে অবশিষ্টাংশ একই ভাবে বের হয়ে যায়।

কেন? একই নিয়মে চলছে কেন? বর্জ্য না বেরিয়ে অন্য কিছু বের হয় না কেন? এসব সাধারণ উদাহরণও আমরা প্রত্যাখান করতে পারবো না!

পশু পাখি ও অন্যান্য সকল প্রাণিদের জীবন ও সৃষ্টির বিন্যাস সুশৃংঙ্খল গতিতে চলমান! এসব কি স্রষ্টা এবং পরিচালনাকারী ব্যতীতই?

মুর্খের দলেরা! পৃথিবীতে মালিকানা ব্যতীত/ কর্তৃত্বকারী/ রক্ষক/ দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যতীত কোন কিছুই নেই। তাহলে পৃথিবী আর নভোমন্ডল কি মালিকানা ব্যতীত? বিস্ফোরনে আর বিকিরণে সৃষ্ট, পরিচালিত?

বাক স্বাধীনতা, উদার মানষিকতা, বিজ্ঞান মনষ্কতার কথা বলে এরা মূলত ধর্ম বিরোধী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করে বা ধর্মহীন হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে স্থির করে। এরা নামে বংশে কোন একটি ধর্মের অনুসারী হিসেবে পরিচয় প্রদান করলেও ধর্মের অনুশাসন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মের স্পষ্ট কোন প্রকাশ

বা অনুসরণ তাদের জীবন-কর্মদ্বারা প্রকাশিত হয় না। বাস্তব জীবনে এরা ধর্ম বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা জানেনা, বুঝেনা, এমন কি ভাবেও না একজন ধর্মপ্রাণ ধার্মিক ব্যক্তি কত বিজ্ঞান মনস্ক, আধুনিক, সমাজবাদী, মানবতাবাদী, পৃথিবীর মঙ্গলাকাঙ্খি এবং মহা-জ্ঞানী হতে পারেন! মূলত উদভ্রান্ত বিকৃত মস্তিষ্কধারীদের কলরব বেশি/ উচ্চ হলে সুস্থ মগজধারী-আত্মাধারী মানুষের মূল্যায়িত হওয়ার সুযোগ থাকে না।

একটু দৃষ্টিপাত করুন! স্রষ্টায় অস্বীকার কারীরা অবশ্যই পরিবারে বসবাস করে। এরা অবশ্যই তার মায়ের সঙ্গে যৌন কর্ম করে না। তার বোন যত সুন্দরীই হোক না কেন অবশ্যই সে তার বোনকে যৌনতার দৃষ্টিতে দেখেনা। সে তার সন্তানকে সন্তানের মতোই ভালোবাসে এবং তার প্রতি কুদৃষ্টি দেয় না। এসমস্ত নাস্তিক্যবাদী ব্যক্তিরা সমকামী হতে পারে কিন্তু তারা ভাইয়ের সহিত সমকামীতায় যায় না। এরা চেষ্টা করে বিয়ে করার, একে অপরের কষ্টে এগিয়ে আসার, অন্যের উপকার করার, সেবা করার, মানবিক সহমর্মিতা এবং দারিদ্রের প্রতি সহানুভূতি এবং সাহায্য করাকে ভালো চোখে দেখা হয়। এসব কেন করে? পারিবারিক বন্ধন, ভালোবাসা, সমাজ বোধ, সম্পর্কবোধ, লজ্জাবোধ ইত্যাদি তাদের মধ্যে কাজ করে। স্ত্রী, মা, ভাই, বোন অন্যান্য নিকট আত্মীয় স্বজন, সম্পর্ক, স্বজন এসবের সৃষ্টি কোথা থেকে?

তারা ধর্মের নানান বিধিবিধানের কোন যৌক্তিক বিরোধীতা করতে পারে না। শুধুমাত্র অন্যায় এবং অসত্য কিছু তথ্যাবলী এবং নিজস্ব মনগড়া উক্তির দ্বারা, বাকস্বাধীনতার দ্বারা ধর্মের বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে (সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অসংগত মিথ্যার দ্বারা)।

মানব স্বাধীনতার কথা বলে কথিত মানবতাবাদীরা আজ সমকামিতাকে বৈধতা দিচ্ছে! কোন কোন রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃতিও নিয়ে ফেলেছে! পারস্পরিক সম্মতিসূচক যৌন মিলনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে! এমনকি বিবাহিত মহিলা পুরুষকে স্বামী/ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারো সহিত যৌন ক্রিয়া/ পরকীয়া করাকে বৈধতা দেয়া হচ্ছে! এসব নাকি মানব স্বাধীনতার অংশ! স্বাধীনতা, আধুনিকতার কথা বলে তারা আমাদের পৃথিবীকে সামাজিক মহা বিপর্যয়কর পরিবেশের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন। এটা কতটা অসংগত এবং অন্যায় আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি? আমাদের

ধর্মগুলোর ধার্মিক/ ধর্মগুরুরা কেহ সেই রকম উচুস্বরে কথা বলছেন না যতটা উত্তপ্ত হয়ে বলা/ প্রতিরোধ করা উচিত ছিল!

সত্য মিথ্যার পার্থক্য, সৎ-পথ এবং অসৎ পথের বিবরণ, সঙ্গত অসঙ্গত, পারিবারিক জীবন, সম্পর্কবোধ, বিবাহিত জীবন, স্বজনের প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা, উপকারবোধ এসব সবই তো ধর্মের সৃষ্টি! আফ্রিকার জঙ্গল থেকে শুরু করে পাপুয়া নিউগিনি, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজানের অদিবাসী, আমেরিকার সভ্যলোক, মধ্য এশিয়ার যাযাবর কোন জাতি, আরব উপদ্বীপের শ্রেষ্ঠ কোন মানবজাতী, তিব্বতের কোন পার্বত্যবাসী অথবা এশিয়ার অন্যকোন জাতী-গোষ্ঠীর মানুষ– এদের প্রত্যেকের মধ্যে যে ধর্ম আছে সেই ধর্মের শিক্ষার কারণে পিতা সন্তানকে হত্যা করে না, প্রাণের বিনিময়ে বাচায়, ভাই বোনকে ধর্ষণ করে না, সঙ্গম করে না, সন্তান মাতাকে বিয়ে করে না, বাবাকে বাবা ডাকে, মাকে পৃথিবীর সবচেয়ে আপনজন হিসাবে ভাবে এবং অন্যান্য স্বজনদেরকে নিয়ে পারিবারিক ভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে।

স্বজন পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং সমাজবোধ এদের জীবনকে পরিপূর্ণ করে। এবং তাদের প্রতিটি সমাজ নিজ নিজ পালনীয় ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ নেই যেখানে ধর্ম নেই। অর্থাৎ ধর্মাশ্রিত মানব সমাজ ব্যতীত পৃথিবীতে কোন জনগোষ্ঠীরা বসবাস করে না, জন্ম গ্রহণ করে না, বেড়ে উঠে না। পৃথিবীতে যদি ধর্ম না থাকতো তাহলে স্রষ্টার কথা কেউ জানতো না। স্রষ্টাকে কেউ ভাবতো না এবং কখনোই স্রষ্টার কথা আলোচনাও হতো না। সর্বোপরি পৃথিবীর মানুষেরা জানতো স্রষ্টা বলতে কোন এক ক্ষমতাধর মালিক নেই! তাহলে কি হতো?

কোন প্রকার ধর্মীয় বিধিনিষেধ, সামাজিকতা, আত্মীয়তা ভালোমন্দের শিক্ষা ইত্যাদি, যেগুলোর দ্বারা আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করছি, একে অন্যের বিপদে এগিয়ে এসে পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ লাভ করছি এসব কিছুই থাকত না এবং মানুষেরা 'মানুষ' হিসাবে সভ্যতার দাবিও করতে পারত না। বরঞ্চ অন্যকিছু হতো!

যে পশু বাচ্চা জন্ম দেয় সেই বাচ্চাই প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে তার জন্মদাতা মায়ের সহিত সঙ্গম করে। পশুপাখিরা মা-বোন চেনে না। শুধু প্রয়োজন পূর্ণ করে। একজন খাবার পেলে অন্যজন কাড়াকারী করে, অপরের প্রয়োজন বুঝেনা।

ভালোমন্দ জ্ঞান না থাকায় পশুপাখিরা যেসব আচরণ করে ঠিক মানুষেরাও তেমনি আচরণ করত যদি ধর্ম না থাকতো এবং ধর্মের বিধানাবলী দ্বারা সমাজ সৃষ্টি না হতো। সম্পর্কবোধ এবং সম্পর্ক সৃষ্টি হতো না। সামাজিক নীতি আদর্শ যা সামাজিকতার সৃষ্টি করে মানুষকে সুন্দর ভাবে বসবাস করার সুযোগ/ প্রেক্ষাপট তৈরী করে তা থাকতো না। মানুষ তার নিজস্ব বুদ্ধি দ্বারা, অন্তঃকরণ দ্বারা, আধুনিক জীবনে উন্নীত হওয়ার মতো, উন্নত জীবন ধারণ করা, আবিষ্কার অর্জনের সময় সুযোগই পেত না! আধুনিক সমাজ ও আমরা পেতাম না!

ধর্ম না থাকায় মানুষ এবং পশুর মধ্যে কর্মজীবন এবং সামাজিক জীবনের যে পার্থক্য আমরা দেখি সেই পার্থক্য গুলো দেখা যেতো না। 'লজ্জা' যেহেতু ধর্মের সৃষ্টি এবং একমাত্র সৃষ্টি হিসাবে মানুষেরাই 'লজ্জাবোধ' করে এবং একে অপরের সম্মুখে পোষাকের মাধ্যমে লজ্জা নিবারণ করে থাকে। যদি ধর্ম না থাকতো তাহলে মনুষ্যত্ববোধ থাকতো না শুধু মাত্র প্রাণিত্ববোধ ব্যতীত;এর ফলে মানুষের মাঝে কোন প্রকার লজ্জাবোধ থাকতো না। এমতাবস্থায় কোন মানুষকে আমরা পোষাক পরা অবস্থায় দেখতাম না বা পোষাক পরার প্রয়োজনীয়তাবোধ করার জ্ঞানও আমাদের মানুষদের থাকতো না।

হে ধর্মবিরোধী নাস্তিকেরা, তোমরা পরিপূর্ণ ভাবে নাস্তিক হও! সামান্য দু-দশটি বই পড়ে নিজেকে জ্ঞানী মনে করো না। তোমরা পরিপূর্ণভাবে ধর্মবিরোধী, ধর্মহীন এবং ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাও এবং ধর্মবিরোধী তোমাদের নানান মনগড়া মতবাদকে নিজেদের মতো করে প্রকাশ করো এবং সেই সাথে ধর্মের কোন প্রকাশ তোমাদের মধ্যে রেখো না। এবং তোমাদের দ্বারা কখনোই যেন কোন ধর্মের কোনরূপ প্রকাশ না ঘটে; যদি তোমরা সত্যিকার ভাবে ধর্মবিরোধী বাকস্বাধীনতাকামী, স্বাধীন চেতা, মুক্তমনা, গণতন্ত্রমনা হয়ে থাক! তোমরা কখনোই ধর্মের কিছু অংশ বা কিছু বিধানাবলী মেনে অন্য কিছু অংশ বা বিধানের প্রতি অযৌক্তিক, অসঙ্গত, মিথ্যা, অন্যায়-বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করো না!

ইচ্ছে হলে বেরিয়ে যাও, ধর্ম ত্যাগ করো, কিন্তু অন্যায় ভাবে আমাদেরকে কষ্ট দিও না।

▶▶ বাস্তবিক অর্থে, আমাদের আধুনিকতা সজ্জিত আধুনিক পৃথিবীতে যাবতীয় প্রতিকুলতার মধ্যে সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে ধর্মের অনুশাসন মেনে ধার্মিক হয়ে, ধার্মিক সমাজ সৃষ্টি করে পৃথিবী ত্যাগ করা। যা আমাদের নৈতিক, সামাজিক

উৎকর্ষতা এবং সামাজিক সংহতি বন্ধন, শান্তিময় বসবাস এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্ববোধের জন্য অতীব সহায়ক; যেমন সহায়ক বৃক্ষের জন্য পানির ব্যবস্থা করা।

কিন্তু নানাবিধ কারনে, সময় স্বল্পতা এবং আধুনিক জীবন, সমাজ ব্যবস্থা আমাদেরকে এক্ষেত্রে সহায়তার পরিবর্তে উল্টোটা করছে যার ফলে আমরা ধর্ম থেকে দূরে চলে এসেছি, ধর্মের নিশানা অবশিষ্ট আছে মাত্র।

এর চেয়েও সমস্যা হলো, একাধিক ধর্ম। আমাদের ধর্মীয় বিবেধ এবং ধর্মীয় আনুগত্য ধর্মীয় বিধানাবলি পালনের ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে এবং এর মাধ্যমে উৎসুক্য মনোভাবের সৃষ্টি হচ্ছে এবং জ্ঞান-স্বল্পতা হেতু ধর্মের প্রতি আমাদের সন্দেহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও অসংখ্য ধর্মের সত্যতা সন্দেহ প্রবনই!

এর চেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে, একটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে মতবিরোধ এবং একাধিক মতবাদ, কোন্দল। এক এক মতবাদ এবং দলাদলী সেই ধর্মানুসারী ব্যক্তিদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি করে পরস্পরের মধ্যে বিভ্রান্তি পূর্ণ বিষেদাগার সৃষ্টি করে নিজেদেরকে ধ্বংশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জ্ঞান স্বল্পতা হেতু ধর্মানুসারীরা উদভ্রান্তের মতো কাদা ছোড়াছুড়িতে লিপ্ত রয়েছে। আর বিশ্বাসী, কিন্তু ধর্মে অমনযোগী ব্যক্তিরা দলাদলি বা কোন্দলের কারণে ধর্ম থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে বা ধর্ম বিমুখ হচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

এই যে সমস্যা বা বাধাগুলো, এ থেকে উত্তরনের জন্য প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান আহরণ এবং গবেষনা এবং ভাববার মতো পর্যাপ্ত সময়। কিন্তু আমরা কিভাবে এসব জ্ঞান গবেষণায় অগ্রসর হবো?

আমাদের অবস্থা এমন যে, ১০ মিনিটের জন্য সালাত বা ধর্মীয় প্রার্থনায় অগ্রসর হবো এই সময় পাইনা! হারাম থেকে বেচে থাকা, অসৎ পথ, মিথ্যা হতে মুক্ত থাকা ইত্যাদি কিছুই পারিনা। এমতাবস্থায় কিভাবে এত গবেষনা করে সঠিক পথের সন্ধান করব?

ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়ার সময় কোথায়!

যত সমস্যা ঐসব ধার্মিক লোকদের! তারাই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী! এদের কাজই ধম-কর্ম করা এবং ধর্ম ভিত্তিক জীবন যাপন করা; অন্য কোন কাজ এদের নেই। এসব লোকেরা দলাদলি করে বিভেদ সৃষ্টি করছে! সমাজ সংসারে কর্মহীন

এসব ধার্মিক লোকদের কারণেই আজ আমাদের ধর্মের এই অবস্থা! ইত্যাদি! ইত্যাদি!

এরপর সাধারণ লোকেরা এসব মন্তব্যের পরে যে কোন একটি দলের বা মতের বা কোন্দলের অনুসরণ করে/ পক্ষাবলম্বন করে, এমন ভাব বাক্যের প্রকাশ ঘটান যাতে ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ মত/ পথের/ অনুসারী কিছু মানুষকে আমরা দেখতে পাই যারা সত্যিকার একটি ধর্মের উপর আগাছা হিসেবে প্রতীয়মান হন।

▶▶ আধুনিক জীবন/ জীবন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট হচ্ছে ব্যক্তি, স্বাধীনতা, আবিষ্কার, অর্জন, অর্থ-সম্পদ দ্বারা পূর্বের মানব সমাজের হতে উন্নত/ সহজ জীবন কাঠামো অর্জন এবং ভোগ উল্লাসের মাধ্যমে মানব জীবন অতিবাহিত করা। আমরা বর্তমানে যে যুগে অবস্থান করছি তা পূর্ববর্তী সকল যুগ হতে স্বতন্ত্র।

অতীত পৃথিবীর রাজা বাদশা উজিরদের রাজত্ব আজ বিলীন। ঢাল তলোয়ার হাতি ঘোড়া দিয়ে পৃথিবী শাসন করা ক্ষুদ্র বড় হাজারো রাজা বাদশাহদের যুগ শেষ হয়ে আসে উপনিবেশবাদী/ সাম্রাজ্যবাদীদের যুগ।

তৎকালীন নব্য শিল্প বিপ্লব আর আবিষ্কার অর্জন দিয়ে তারা সারা পৃথিবীজুড়ে রাজত্ব কায়েম করে। কামান আর বন্দুক দিয়ে শতাধিক সৈন্য হাজারো/ লাখো বাহিনীকে পরাজিত করতে থাকে। বৃটিশ, পুর্তুগীজ, ফরাসী, ডাচ এই চারটি শক্তির দ্বারা পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এক হতে দু-আড়ইশত বছর পর্যন্ত শাসন/ শোষন চলতে থাকে। এরপর শুরু হয় আধুনিক ঊনিশ শতক; ব্যক্তি আর স্বাধীনতার বন্দনা যার মূল উপজীব্য।

আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থায় সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদ আজ মুষ্ঠিমেয় ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত। আঠারো ও উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লব, স্বাধিকারের বিপ্লব আজ নেই। বিংশ শতকে এসে স্বাধীনতা-স্বা-ধিকার এর আন্দোলকে কেউ গ্রহন করতে চায় না। স্বাধীনতাকামীদেরকে সন্ত্রাসী আক্ষা দিয়ে দমন করা হয়। এই শতক হচ্ছে ব্যবসা-মুনাফা-স্বার্থ সিদ্ধির শতক! স্বাধীনতা কামীদের এখানে স্থান নেই।

এমতাবস্থায় অদুর ভবিষ্যতে মানব সমাজের কোন বিপ্লব আমাদেরকে গ্রাস করবে তা আল্লাহ ভালো জানেন।

এখন আর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঢাল তলোয়ারে, দেহ কসরতে যুদ্ধ হয় না। যুদ্ধ হয়, হবে পারমানবিক পাওয়ারে, কার্পেট বোম্বিং আর মিসাইলের বোতাম টিপে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা বলছি আমরা! কি স্বাধীনতা? কোথায় রয়েছে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা? আমরা কি জানি! কতটুকু জানি?

প্রকৃত অর্থে "ব্যক্তি-স্বাধীনতা" বলতে কিছু আছে কি! মায়ের কোল হতে মৃত্যু পর্যন্ত কোন মানুষ স্বাধীন হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়। কোলের শিশুকে তার 'মা' স্বাধীনতা দেন না। দিলে তার মৃত্যু ঘটতে পারে। বালক কে তার মা-বাবা স্বজনেরা কখনোই স্বাধীনতা দেন না। ছোট বালক বালিকাকে শাসন করেন নি এমন কোন মাতা-পিতা আছেন কি না আমার জানা নেই। সময় মত খাওয়া ঘুম শিক্ষা ইত্যাদিতে মগ্ন না থাকলে বালকটিকে শাসন করা হয়। কঠোর জীবনে অভ্যস্থ করানো হয়! কেন?

বালকটি কিন্তু তার বাল্যকাল কে অসহ্য যন্ত্রনাদায়ক মনে করে দ্রুত বড় হতে চায়! কিশোর/ যুবক অবস্থায় আমাদের সমাজ কি স্বাধীনতা দেয়?

পরিবারের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে গিয়ে যুবক যদি তার ব্যক্তি/ বাক স্বাধীনতা অনুযায়ী চলে তা হলে সমাজ/ রাষ্ট্র প্রতিরোধ/ প্রতিকার করার ব্যবস্থা করে।

প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই কি আমরা কেহ স্বাধীন ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারি?

পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীরা কি স্বাধীন?

অর্থ আর ক্ষমতাবান হলেই কি স্বাধীনতা অর্জন/ ভোগ করা যায়?

কখনোই না। আমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করতে পারবো না, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলতে পারবো না। সমাজ, রাষ্ট্র পরিবার প্রত্যেকের দিকে খেয়াল করে আমার বক্তব্য এবং কর্মের প্রকাশ ঘটাতে হবে। শিশু কাল হতে মানুষ এই শিক্ষা গ্রহণ করেই বড় হয়। এই শিক্ষা যদি কাহারো না থাকে তাহলে রাষ্ট্র সমাজ প্রতিকার এবং প্রতিরোধে দাড়িয়ে যায়। আমাদের প্রতিটি মানুষের জীবন/ কর্ম অপর এক বা একাধিক মানুষের সহিত সার্বক্ষণিক সংস্পৃষ্ট অবস্থায় থাকে এমতাবস্থায়

'মানুষ' স্ব-ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে চাইলে বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয় সব সময়।

▶▶ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি প্রাণি এবং প্রতিটি নিশ্চল জীবের শ্রেণি, কাউকে আল্লাহ 'স্ব-স্বাধীনতা' দেননি; প্রত্যেকে মহান স্রষ্টা আল্লাহর গোলাম। তবে তারা স্ব-স্বাধীনতার মাধ্যমে অবাধ্যতা করতে পারে! এই শক্তি দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মুহুর্ত অধীন/ অধিনস্ত, আজ্ঞাকারী অথবা অনুসরণকারী, বক্তা অথবা শ্রোতা এই তিনটি অবস্থায় থাকে। আরও একটি অবস্থা হলো মান্যকারী অথবা বিরুদ্ধাকারী, প্রতিবাদকারী। এমতাবস্থায় ক্ষমতাবান, প্রয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে। জেল, যুলুম, শাস্তি, ফাঁসি, যাই আমরা বলিনা কেন!

মানুষদের ক্ষেত্রে যদি এমন বিচারের ব্যবস্থা হতে পারে তাহলে সমস্ত সৃষ্টি জগতের ক্ষেত্রেও মহান স্রষ্টার নির্ধারিত বিচার ব্যবস্থা আছে ইহকালীন এবং পরকালীন। এতে কোন সন্দেহ নাই।

ব্যক্তি আর বাক-স্বাধীনতা বলতে আমরা যা করছি এবং বোঝানো হচ্ছে তার অধিকাংশই স্রষ্টার নির্দেশনা এবং ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে দাড়াচ্ছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা/ মানব-স্বাধীনতার কথা বলে যত প্রকার কৌশল/ কার্যকলাপ করা হচ্ছে তার অধিকাংশই ধর্মকে আঘাত করছে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয়/ আঞ্চলিক স্বাধীনতার স্লোগান/ বক্তব্যগুলোকে মানুষের/ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ব্যবসায়িক ও অন্যান্য স্বার্থ উদ্ধার করা হচ্ছে নানাভাবে। কারণ মানুষেরা চাইলেই অঞ্চলগত/ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দিতে হবে, সেই সময়/ প্রেক্ষাপট এখন আর নেই । আমি আধুনিকতা এবং স্বাধীনতার বিরোধী নই তবে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আমাদের প্রতিটি ধর্মাবলম্বী মানুষদের ভাবা উচিত!

জীবন ধারণ করার স্বাধীনতা, কর্মজীবনের সন্ধান করার স্বাধীনতা, কর্ম করার স্বাধীনতা, ধর্মবোধ নিয়ে বেচে থাকার স্বাধীনতা, অঞ্চল গত সমাজবদ্ধ হয়ে বেচে থাকার স্বাধীনতা; সবই যৌক্তিক এবং সঙ্গত দাবী হতে পারে। এবং এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে আমরা প্রায় দুই শত রাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছি। এসব নিয়ে কোন ধর্মের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধীতাও নেই। বরং মাতৃভুমির প্রতি করণীয় উৎসাহিত হয়েছে। স্বাধীনতা, স্বা-ধিকারের আন্দোলন এভাবে হতে পারে এবং এটাকেই স্বাধীন-স্বাধীনতার স্লোগান বলা যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন

রাষ্ট্র কমই আছে যারা কোন অঞ্চলের মানুষদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দিয়ে নিজ সীমানা ছোট করবেন! প্রয়োজনে যেকোন উপায়ে ধ্বংসলীলা চালাবেন কিন্তু স্বাধীনতা দিবেন না! যাহোক, এসব আমার আলোচ্য মূল বিষয় নহে!

আমি একজন মানুষ। আমি ধনী হতে পারি, গরীব হতে পারি, শিক্ষিত কিংবা মুর্খ, সাদা বা কালো, যে কোন জাতীর, যে কোন ধর্মের অনুসারী হই না কেন সাধারণ কিংবা অসাধারণ কোন ব্যক্তি হিসাবে পৃথিবীতে বসবাস করি না কেন সমষ্টিগত ভাবে আমরা মহান আল্লাহতায়ালার সৃজিত সাধারণ মানুষ ব্যতীত অন্য কিছুই নই। মানুষদের মধ্যে সৃষ্টিগত বা সৃষ্টিজনিত কোন পার্থক্য নেই এবং পৃথিবীতে যে সমস্ত পার্থক্য সূচক গুনাবলী দ্বারা মানুষদের মধ্যে বিবেধ সৃষ্টি করা হয়, উঁচু নীচু এবং বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের ব্যাপক প্রকাশ আমরা দেখি তা আসলে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং মহান স্রষ্টার ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশও নয়। শুধুমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার আনুগত্য করার মাধ্যমেই প্রকৃত কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব এবং এর দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হওয়া সম্ভব।

আমাদের কেহ ধর্ম গুরু হতে পারেন, কেহ ধর্ম ভীরু হতে পারেন, কেহ সম্পদশালী হতে পারেন, কেহ দরিদ্র হতে পারেন এসব ব্যবধান পার্থক্য এবং তারতম্য আসলে আমাদের নিজস্ব ইচ্ছায় হয়নি যদিও কর্মসংক্রান্ত উত্থান পতনের দায় আমাদেরই। কারণ বৈচিত্র পূর্ণ জীবনে আমাদের করণীয় বিষয়াবলীই মুখ্য। কিন্তু ব্যাপক অর্থে এসব মহান মালিকের পূর্ব নির্ধারিত এবং স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রিত। তিনি আমাদের কার্যকলাপ ও ফলাফলে নির্ধারিত বিধানাবলি এবং কার্যকারণের নির্দিষ্ট সূত্র ব্যতীত হস্তক্ষেপ করেন না। যদিও তিনি অতীত-বর্তমান ভবিষ্যত সবই জানেন। মানুষ যা কিছু করছে এবং তার ফলাফল কেমন হবে সবই তার জানা। যেহেতু মানুষ তার ইচ্ছায় স্ব-প্রণোদিত হয়ে কাজ করছে সুতরাং তার কর্মফল এর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে।

আমরা স্রষ্টা বিরোধী ভাব প্রকাশ করতে পারিনা কোন ক্রমেই। আমাদের প্রত্যেকের করণীয় দ্বায়িত্ব কর্তব্যকে সামনে এনে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। যদি আমরা মুর্খ থাকি তাহলে আমাদের জ্ঞান প্রাপ্তরা অজ্ঞদেরকে স্মরণ করাবেন, শিক্ষা দিবেন এটা তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। অন্যথায় তাদেরকে কৈফিয়ত দিতে হবে। এমন এক সময় আসবে যখন, জ্ঞানী এবং কর্তব্যে অবহেলাকারীরা

মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালার নিকট জবাবদিহিতার মাধ্যমে নিজেরা দায় গ্রহণ করে প্রকারান্তরে মুর্খদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করে দিবেন।

একজন সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মহান আল্লাহতায়ালার অন্ধের প্রতি যতটুকু ভালবাসা আছে ঠিক ততটুকু ভালাবাসা আছে চক্ষুস্মানের প্রতি, ধর্ম ভীরুর প্রতি যতটুকু ভালবাসা আছে ধর্মহীন অধার্মিকের প্রতি ঠিক ততটুকুই সৃষ্টিগত ভালবাসা আছে! যত দিন সে পৃথিবীতে বেচেঁ থাকে। জ্ঞানীর প্রতি, ধনীর প্রতি, বিশিষ্টের প্রতি যতটুকু ভালবাসা আছে ঠিক ততটুকু ভালবাসা আছে মুর্খ, গরীব ও সাধারণের প্রতি।

মানুষদের প্রতি 'আল্লাহ'র যতটুকু ভালবাসা আছে অন্যান্য প্রাণিদের প্রতি ততটুকুই সৃষ্টিগত ভালবাসা আছে। এসব ভালোবাসা মহান সৃষ্টিকর্তা, মহত্তম পবিত্রতম সত্তা আল্লাহতায়ালার সৃষ্টিগত। সৃষ্টিগত ভাবে তিনি সকল সৃষ্টিকে সমান ভাবে ভালবাসেন। তফাত তারতম্য শুধু মাত্র কর্ম কেন্দ্রিক। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত একজন নিকৃষ্টতম অপরাধী ব্যক্তি অপরাধ করা সত্ত্বেও মহান স্রষ্টার দয়া ভালোবাসার মধ্যে থাকেন। এমতাবস্থায় তার অপরাধের ফল ভোগ স্বরূপ কার্যকারণ সূত্রানুযায়ী/ বিধানানুযায়ী কিছু শাস্তি দুনিয়াতে পেয়ে থাকেন (তার স্রষ্টার প্রতি ফিরে আসার বার্তাস্বরূপ)। যদি যে মৃত্যুর পূর্বে অনুশোচনায় ভোগে এবং পাপবোধে অশ্রুসিক্ত হয়ে মহান স্রষ্টা সমীপে সত্যিকার অর্থে বিনীত হয় এবং অপরাধ থেকে বিরত হওয়ার ইস্পাতকঠিন দৃঢ় মনোবল ধারণ করে তাহলে সে মহান স্রষ্টার নিকট শ্রেষ্ঠতম কোন ধার্মিক ব্যক্তির মতই প্রিয় হিসাবে গণ্য হবে। পৃথিবী এবং পরবর্তী সময়টা মানুষদের জন্য কর্ম কেন্দ্রীক। কর্ম মঙ্গলজনক হলে সে সুফল প্রাপ্ত হবে এবং অমঙ্গল জনক হলে সে দূর্দশাগ্রস্থ হবে এবং এক্ষেত্রে সুক্ষাতি-সুক্ষ্ম বিচার করা হবে এবং অনুপরিমাণ ভালো বা মন্দ কর্মফল ভোগ করতে হবে। ইহকাল এবং পরকাল একই সূত্রে গাথা, অনেকটা আগে এবং পরের বিষয়ের মত।

ভালো/ মন্দ কর্মের দ্বারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার আনুগত্য সূচক বিধানাবলীর প্রতি অন্যায়, কর্তব্যে অবহেলা এবং দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলে তার শাস্তি তিনিই দেবেন অথবা অন্য কোন কারনে ক্ষমাও করতে পারেন এটা সম্পূর্ণ মহান স্রষ্টার ইচ্ছা। এমতাবস্থায় পাপিব্যক্তির প্রতি পৃথিবীবাসী কোন ধার্মিক ব্যক্তির বিন্দুমাত্র অহংকার ঘৃণা বা কুৎসা ছড়ানোর অধিকার মহান আল্লাহতায়ালা

কাউকে দেননি। যদিও পৃথিবীতে আইন/ বিধান লঙ্ঘন করার দায়ে শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে সে।

সভ্যতা বহির্ভূত মুর্খ, কোন যাযাবর বা কোন সাধারণ গ্রামবাসী ব্যক্তি বা জঙ্গলে বসবাস করা কোন সাধারণ ব্যক্তি যারা প্রাণিসম জীবনাচারে জীবন অতিবাহিত করে অথবা এমন কোন ব্যক্তি যারা সভ্যতা বহির্ভুত জীবন ধারণ করে মৃত্যুবরণ করল অথবা দরিদ্র, দূর্বল বা সাধারণ নিষ্পেষিত ব্যক্তি যারা না পারল ভাল কিছু খেতে না পারল সুখের মাধ্যমে জীবন জগতকে উপভোগ করতে, জীবনকে ভোগ করতে! অপরদিকে সভ্য পৃথিবীর কোন ধার্মিক বা অধার্মিক ব্যক্তি যার রয়েছে অত্যাধুনিক জীবন বা ভোগ সামগ্রী, মনে করুন সভ্যপৃথিবীর ক্ষমতাধর কোন প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, কোন সম্মানিত বাদশাহ্ বা খ্রীষ্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা পোপ বা মুসলমানদের পবিত্র গৃহ কাবা শরীফের ইমাম সাহেব-এমন ব্যক্তি বর্গের সহিত কোনই পার্থক্য করা যাবে না, তুলনামূলক ক্ষুদ্র করা যাবেনা, অবজ্ঞা করা যাবেনা ঐসব মানুষদেরকে।

বরং জ্ঞান বুদ্ধি সভ্যতার নাগালের বাইরে ঐসব সাধারণ মানুষদের তুলনায় সম্মানিত উল্লেখ্য ব্যক্তি বর্গের মর্যাদা তুচ্ছ হতে পারে যদি 'আল্লাহ' ইচ্ছা করেন (তাদের ভোগের কারণে)।

শপথ আল্লাহতায়ালার! যদি কেহ মনে করেন দরিদ্র ক্ষুধার্ত অসহায় নিষ্পেষিতদের চেয়ে আমি বা আমরা যারা ধনী, জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ বা আমরা সেরা, আমরা সুপথ প্রাপ্ত এবং সম্মানিত– তারা ইহকালে কষ্টভোগ করল এবং পরকালেও কষ্টভোগ করবে আমরা তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ, এমন ধারনা পোষণকারীরা নেহায়েতই মুর্খ এবং ধর্মহীন ব্যতীত অন্য কিছুই নন।

বরঞ্চ আমাদের মত আধুনিক জীবনবোধে উজ্জীবিত এবং আধুনিক সভ্য, জ্ঞানবান, ভোগবাদী ব্যক্তিদেরকে প্রশ্ন করা হতে পারে, কেন ঐ সমস্ত মানুষেরা মহান-স্রষ্টা 'আল্লাহ' সম্পর্কে জ্ঞাত হলো না?

কেন তারা অজ্ঞ থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল?

কেন তারা আল্লাহর বাণীসম্পর্কে জ্ঞাত হলো না? কেন তারা দরিদ্র অবস্থায় জীবন পাড়ি দিল! আমাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। জ্ঞানহীন মুর্খলোক যারা অজ্ঞ, যাদেরকে সভ্যতা দ্বারা, ধর্মজ্ঞান দ্বারা আলোকিত

করা হয়নি তাদের দুখঃপূর্ণ জীবন এবং অতিসাধারণ জীবনাচার এর কারণে তাদের প্রতি মহান আল্লাহতায়ালার মমত্ববোধ বেশি। সম্ভবত, তাদেরকে ক্ষমা করা হবে অথবা স্রষ্টা হিসাবে একচ্ছত্র ক্ষমতাধর 'আল্লাহ' যা ইচ্ছা করবেন এটা একান্তই তার ইচ্ছাধীন।

একটু ভেবে দেখুনতো, কিছু মানুষকে খাওয়ানো হয় কিছু মানুষকে খাওয়ানো হয় না! কিছু মানুষকে ভোগের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তারা যতটুকু ভোগ করে তার চেয়ে বেশি অপচয় করে, কিছু মানুষকে মন্দকর্মে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ফলে তারা পৃথিবীকে পাপের জলোচ্ছাসে আবৃত করতে চাচ্ছে, কিছু মানুষকে ভালোকর্ম করার সদিচ্ছায় পাগল বানিয়ে রাখা হয়েছে, কিছু লোককে জ্ঞান দান করা হয়েছে তেমনি কিছু লোককে অজ্ঞ রাখা হয়েছে। কেউ ধর্মভীরু কেউ ধর্মহীন। এই বৈচিত্র এই ক্ষমতা সমস্তই মূলত আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন এবং এসব মানুষদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহতায়ালার জানা।

এখানে মুল বিষয় হচ্ছে বা একজন মানুষের জন্য ন্যূনতম করণীয়/ কর্তব্য হচ্ছে– খাওয়ানো ব্যক্তির কর্তব্য অনাহারীর খোজ নেওয়া, ন্যূনতম ইচ্ছা রাখা। ভোগবাদীর কর্তব্য হলো নিজে ভোগ কম করে অন্যকে ভোগ করার সুযোগ দেওয়া ইচ্ছা রাখা, অপচয় না করা। ধনীর কর্তব্য হলো দরিদ্রকে সাহায্য করা, জ্ঞানবানের কর্তব্য হলো মুর্খব্যক্তিকে জ্ঞানদান করা, চেষ্টা করা, ইচ্ছা করা। সুপথ প্রাপ্ত ব্যক্তির কর্তব্য হলো কৌশলে যুক্তিপূর্ণ সংজ্ঞত সঠিক বাক্যাবলি সহকারে বিপথগামী ব্যক্তিদের সৎ পথে আহব্বান করা, চেষ্টা করা, কামনা করা। ক্ষমতাবান/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো ক্ষমতার অপব্যবহার না করা, প্রদর্শন না করা, সঠিক স্থানে সঠিক ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষ এবং সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; ইত্যাদি।

এসব কর্তব্যের কতটুকু আমরা পালন করছি বা না করছি এটাই হবে একজন মানুষ হিসেবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের এবং পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার সারবিষয়। কষ্ট বা আনন্দ পাওয়ার মাপকাঠি; পৃথিবীর জীবনে ব্যক্তিগত/ সমষ্টিগত এবং পরকালে শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে।

আমাদের আধুনিক জীবনে, আধুনিক পৃথিবীতে সমস্ত মানুষই আধুনিকতার সুফল ভোগ করছে না বা সমষ্টিগতভাবে সমস্ত মানুষের সুফল ভোগ করা সম্ভব নয়। আধুনিকতার সুফল ভোগকরার জন্য কিছু লোক উপযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হন

এবং আধুনিকতায় তারা নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন। অপরদিকে বেশিরভাগ লোক আধুনিকতার কুফল ভোগকরে নিজেরা অসহায় এবং হীনতা গ্রস্থ হিসাবে জীবন যাপন করছেন। এমতাবস্থায় সভ্য আধুনিক মানুষদের জীবনাচারের দিকে তাকিয়ে থাকাই আধুনিক সভ্য মানব সমাজের অধিকাংশ মানুষের লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছে। এসমস্ত অধিকাংশ মানুষদের পৃষ্ঠদেশে ভর করেই সভ্যতা, আধুনিকতার নৃত্যগীত মঞ্চস্থ হচ্ছে। সেই নৃত্য আর সৌন্দর্য্যে স্বপ্ন তৈরী হচ্ছে! পৃথিবীর সেই রঙ্গিন স্বপ্নগুলো মানুষদেরকে উম্মাদ করে রেখেছে এবং স্ব-দিকে আকৃষ্ট করছে!

▶▶ আধুনিক জীবনের যে চিত্রায়ন আমরা দেখছি তার কুশিলবদের সংখ্যা আর মঞ্চায়িত প্যান্ডেলের সংজ্ঞায়িত দর্শক/ মূল উপভোগকারীদের সংখ্যা সামান্যই। অন্যদিকে শতশত কোটি মানুষ আছেন যারা আধুনিক জীবন আর সভ্যতার নির্মমতায় বলি হচ্ছেন। তাদের নির্মমতার দৃশ্য এবং আধুনিকতার উল্টোপিঠের চিত্রায়ন কোথাও দেখানো হয় না এবং এসব নিয়ে কেউ ভাবেও না। ধনী পুজিপতি আর বিলাসবহুল জীবনে সুখ ভোগকারীদের সংখ্যা সামান্যই। বিশিষ্ট লোকদের সংখ্যা সামান্য এবং এসব লোকেরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন আর পৃথিবীর মানুষেরা তাদের অনুসরণ করছে এবং লালায়িত হচ্ছে তাদের মতো জীবন লাভ করার। কিন্তু পথিমধ্যে হারিয়ে/ নিমর্মতার শিকার হওয়া মানুষদের খোঁজ কেহ রাখছেন না।

এমতাবস্থায়, লালায়িত/ আকৃষ্ট করার নানা উপায়, উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে পৃথিবীবাসী সাধারণ মানুষদেরকে প্রতিযোগীতায় আহবান জানানো হচ্ছে এবং এসব নানারূপ প্রতিযোগিতায় সে সব বিশিষ্ট সমাজপতিরা ব্যবসা খুলে বসেছেন এবং নানান কৌশলে সম্পদ এবং সম্মান আহরণ করে নিচ্ছেন অধিকাংশ জনগোষ্ঠির সাধারণ মানুষদের নিকট হতে। এটি একটি জটিল বিষয়। আমাদের সাধারণদের মাথায় সহজেই ঢুকবে না।

আমাদের নিকট আজ ধনবান, বিত্তবান, পুজিবাদী, বুদ্ধিজীবি শিল্পী, সাহিত্যিক, যৌনতা নির্ভর শিল্প বানিজ্যকারী এবং শাসক শ্রেণীর লোকেরা; আদর্শ হিসাবে দাড়িয়েছে। আমরা আজ তাদের অনুসরণ করে সভ্য সুখি হওয়ার লক্ষ্যে যতটুকু লাভবান হচ্ছি বা না হচ্ছি তার চেয়ে বেশি বা নিশ্চিত লাভবান হচ্ছেন সেইসব মানুষেরা, যাদেরকে আমরা অনুসরণ করছি।

আজ এই সভ্য পৃথিবীর বিশাল সম্পদ রাশির শতকরা ৮০ ভাগ মালিকানা মাত্র শতাধিক মানুষের নিকট জিম্মি।

পৃথিবীতে বিশাল বিশাল অস্ত্রভান্ডার গড়ে উঠেছে আর সেই অস্ত্রভান্ডারের নিয়ন্ত্রণ করছেন গুটি কয়েক ব্যক্তি মাত্র। যাদের ইশারায় সমগ্র পৃথিবীর সুখ সৌন্দর্য মাত্র কয়েক মিনিটে বিরান হওয়া সম্ভব এবং আমাদের পৃথিবী আজ এই পথেই এগুচ্ছে। এই পৃথিবীতে দেহ কেন্দ্রিক/ যৌনতা কেন্দ্রিক নগ্ন বানিজ্যিকরণের যে জৌলুস পৃথিবীর মানুষদেরকে মোহতায় আকৃষ্ট করছে এবং পৃথিবীর শতশত কোটি সাধারণ মানুষেরা স্বপ্নের মতো জীবনে অবতীর্ণ হওয়ার এবং সুখভোগ করার ইচ্ছায় বিভোর হয়ে আছেন সেই বাণিজ্যের কর্ণধার এবং সেই বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ করছেন মাত্র কয়েকশত নগ্ন পরুষ এবং মহিলা যাদেরকে বিকারগ্রস্থ, অসৎ, চরিত্রহীন, নৈতিকতাহীন, ধর্মবিবর্জিত, নষ্ট, ভ্রষ্ট হিসেবে প্রতিটি ধর্মের মানুষদের নিকট চিহ্নিত।

কিন্তু আমরা আজ এই সমস্ত পরুষ এবং মহিলাদের চিত্রই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিরীক্ষণ করছি, অনুভব করছি, উপলব্ধি করছি এবং আকাঙ্খিত হচ্ছি, সুরসুরি লাভ করছি, নির্বোধ পশুদের মতো। যেমন গৃহপালিত প্রাণিদেরকে লোভ/ খাবার দেখিয়ে ঘুরানো সম্ভব হয়; ঠিক তেমনই।

ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াগুলো আজ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষদের জীবনের চিন্তা-চেতনা, ভাব-ভঙ্গিমা লক্ষ্য-উপলক্ষ্য আর সামগ্রিক গতির শতকরা ৭০ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সমষ্টিগত ভাবে মানুষদেরকে ধর্ম থেকে বের করে আনছে।

ব্যবসায়িক অগ্রগতি/ মুনাফা লাভের জন্য মিডিয়াগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। নৈতিকতা আর সত্যের পৃষ্ঠে পদাঘাত করে অদম্য মিথ্যাচারিতার মাধ্যমে অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থসম্ভারের পাহাড় গড়ে তুলেছেন।

আধুনিক মিডিয়াগুলোর মাধ্যমে এবং লক্ষ্যে উপলক্ষ্যে যা কিছু করা হচ্ছে তা আমাদের পৃথিবীস্থিত ধর্মগুলোকে নৈতিকভাবে আঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই করছে না। কিন্তু আমরা ধার্মিকেরা কিছুই বুঝি না! বরঞ্চ কিছু কিছু ধার্মিক ব্যবসায়ীরা মিডিয়ার মাধ্যমে ধর্মের মূল নীতি-আদর্শকে লঙ্ঘন করে ধর্ম প্রচার করে“পূণ্য লাভের মানসিকতা”র প্রচারের মাধ্যমে মানুষদেরকে প্রকৃত অর্থে ধ্বংস করছেন। মানুষদের সত্যিকার ধর্মীয় বোধটাকেই নষ্ট করছেন!

আমরা পৃথিবীর সংগ্রামী জীবনে কেউ উদভ্রান্ত এবং কেউ পথ প্রাপ্ত। আমাদের অসহায়ত্ব, পথ প্রাপ্তি/ অর্জনকে ছাপিয়ে ফেলেছে। আমরা আজ জীবন সংগ্রামে পর্যদুস্থ হয়ে পড়েছি এবং আমাদের অনেকে জীবনের শেষ ভাগে এসে এক রাশি শুন্যতায় হাহাকার ধ্বনি শুনছি এবং শুনাচ্ছি। আমাদের অনেকেই কর্মজীবনের ব্যস্ততায় ডুবে জীবন যাপন করছি। আমাদের অনেকেই মাঝে মধ্যে বিষন্নভাবে অতীত-বর্তমান আর ভবিষ্যত ভাবেন এবং ভাবেন এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা এবং যান্ত্রিকতার না আছে সুখ না আছে কোন কিছুতেই প্রকৃত তৃপ্তিবোধ!

▶▶ সাধারণ মানুষদের মত পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠান/ আবিষ্কারগুলোর স্থপতিরাও তার আপন সৃষ্ট আবিষ্কার/ প্রতিষ্ঠানের বিশাল, সুক্ষ্ম কর্মযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ, নিয়মানুবর্তিতা, শৃংখলা আর যান্ত্রিক ছকের নিকট পৃথিবীকালীন সময়েই মূল্যহীন হয়ে পড়েন! তার আবিষ্কার অর্জন তাকে নিদারুন মানষিক আঘাতে জর্জরিত করতে থাকে! পৃথিবী হতে বিদায় হওয়ার পূর্বে আপন মূল্যহীনতা, অসহায়ত্ব যথার্থভাবেই অনুভব করতে পারেন! কিন্তু আফসোস ব্যতীত কিছুই করণীয় থাকে না।

অবশেষে মৃত্যু-কালীন সময়ে প্রকৃত সাহায্যকারী কোন মানুষও জোটে না। অথচ লাখো লাখো কর্মীভক্ত স্বজন অনুসারী অধীনস্তের ভিড় সামাল দেয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে! নিদারুন আক্ষেপ আর হাহাকার নিয়েই বিশিষ্ট মানুষরূপী যান্ত্রিক দেহ হতে 'আত্মা' চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে এমন দিকে অগ্রসর হয় যে দিকের/ পথের সঠিক জ্ঞান তার পৃথিবীয় শরীর দিয়ে অর্জন করার কথা ছিল কিন্তু করেননি! পৃথিবীর সম্পদ সম্মানের লক্ষ্যে কৌশল সন্ধানেই ব্যয় করেছেন!

সবকিছু ফেলে বিদায় বেলা যা কিছু পাচ্ছেন তা হলো মানুষরূপী যন্ত্রগনের নীরবতা অনুষ্ঠান আর বিদায়/ স্মরন-বন্দনা! নীরবতার স্মরণ অনুষ্ঠান, মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথিবীর অবশিষ্ট মানুষদের সর্বশেষ কর্তব্যবোধের অনুষ্ঠান মাত্র! এসব কিছু পরকালে প্রস্থানকৃত আত্মার প্রকৃত কোন কাজে/ স্বার্থে আসে না।

কি মূল্য আছে মানব আত্মা দিয়ে প্রেরিত মানব জীবনের? যদি সেই মানব আত্মাকে প্রাণিত্বে পরিণত করে স্বরূপ ভুলে যাওয়া হয়!

আমাদের অনেকেই আত্মিয়তা স্বজন সমাজের দ্বারা নিগৃহিত হয়ে নিজের সমাজেই পরবাসী জীবন যাপন করছেন। আমাদের অনেকেই আজ নির্যাতিত

নিষ্পেষিত হয়ে ক্ষমতাসীনদের পানে তাকিয়ে আর্তি উচ্চারণ করছেন। আমাদের অনেকেই আজ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়ে পৃথিবী থেকে বিচ্ছুত হয়ে নিঃশ্বতায় ছিটকে পড়েছেন এবং অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন। আমাদের অনেকেই মজলুমের মতো বিচার প্রার্থী হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, বিচার পাচ্ছেন না। আমাদের এই সভ্য সমাজের সভ্য মানুষদের কু-কীর্তির দায়ভার অবশ্যই সভ্য মানুষেরা বহন করেন না। কেবল মাত্র সভ্যতা লাভ করতে পারেননি, সভ্য হননি, আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্য সমূহ দ্বারা নিজের জীবনকে সাজাতে পারেননি, এমন মানুষেরাই এসব দায়ভার নিয়ে পৃথিবীতে দিন যাপন করেন। এবং তাদেরই হাহাকার, আর্তনাদ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পৃথিবীর যাবতীয় সুখ সম্ভারকে উড়িয়ে, পুড়িয়ে ফেলতে চায় কিন্তু আমাদের উপলব্ধিতে আমরা বুঝতে পাইনা।

আমাদের পৃথিবীর অনেকেই পৃথিবীটাকে স্বল্পস্থায়ী মনে করে পরকালীন কর্মে ব্যপৃত হতে চান এবং অতীত ভুলে গিয়ে ভালো মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে বসবাস করতে চান। তেমনই অনেক মানুষ সৎ পথ ভুলে গিয়ে মন্দপথে সুখ ভোগ করার চেষ্টায় লিপ্ত হন। এমনই ব্যাপক বিস্তৃত আমাদের মানুষদের কর্মপরিকল্পনা কর্মসম্পাদন এবং কর্মফল ভোগ। সব মিলিয়ে আমরা আজ আধুনিক সভ্য পৃথিবীর বাসিন্দা হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করতে চাই, সভ্য হতে চাই এবং বিশিষ্ট হিসাবে পৃথিবী ত্যাগ করতে চাই। যদিও আমরা অধিকাংশই সভ্য নই এবং বিশিষ্ট হওয়ার মতো যথার্থতা আমাদের মধ্যে নেই এবং আমরা যাদের অনুসরণ করি তাদের অনেকের মধ্যেও নেই; সত্যিকার অর্থে।

একজন মানুষ হিসেবে ন্যূনতম করণীয়

আমরা মানুষেরা নানাবিধ প্রয়োজন পূরণ করি নিজেদের ইচ্ছা, চেষ্টা, সঠিক কর্ম নির্ধারণ এবং সম্পাদনের মাধ্যমে। এমতাবস্থায় ফলাফল স্বরূপ প্রয়োজন পূরণ হয়, লক্ষ্য অর্জিত হয়, ফল লাভ করি, ফল ভোগ করি, ইত্যাদি।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো যখন আমাদের নিকট প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয় তখনই এসব অর্জন করার জন্য নানাবিধ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়েই তবে লাভ করি। উক্ত চাহিদা গুলোকে মৌলিক বা মূল চাহিদা হিসাবে যখন কোন মানুষ স্থির করবে না বা পূরণ করার লক্ষ্যে জীবনকে ব্যয় করবে না, সেই সমস্ত মানুষ আমাদের নিকট পাগল/ উদভ্রান্ত হিসেবে গণ্য হন। এবং আমরা তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করি।

আমি মনে করি মৃত্যুবরণ করা এবং মৃত্যুবরণ করে পৃথিবী হতে বিতাড়ীত হওয়া মানুষদের মূল লক্ষ্য/ চাহিদা নয় তবে "মূল গন্তব্যস্থল"। এটা কেহই অস্বীকার করবেন না! কেহ প্রত্যাশা না করলেও এই পর্যায়ে সবাইকে যাত্রা করতে হবে। সুতরাং মৃত্যুর চিন্তা করা এবং পরবর্তী জীবনের জন্য ভাবা, কর্ম নির্ধারণ করে করণীয় কর্ম সম্পাদন করাও মানুষদের অন্যতম মৌলিক বিষয়; বলা যেতে পারে "মৌলিক লক্ষ্যের" বিষয়।

উপরোক্ত "মৌলিক লক্ষ্য" এর বিষয়টি সামনে রেখে সঠিক পথ/ করণীয় নির্ধারণ করা আমাদের নিকট অতীব জটিল মনে হয়। তবে আমরা মানুষেরা যদি এমন প্রয়োজনকে স্থির করে ইচ্ছা প্রকাশ করি এবং কর্তব্য স্থির করার লক্ষ্যে চেষ্টা করি এবং আপন স্রষ্টা সমীপে বিনীত প্রার্থনা করি তাহলে মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্' আমাদের চেষ্টাকে অবশ্যই বিফল করবেন না।

মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমি কোন পরিশ্রমীর পরিশ্রমকে বৃথা করিনা"

মহান স্রষ্টা আল্লাহর উক্ত কথার সূত্রেই পৃথিবীর যাবতীয় আবিষ্কার অর্জন আমরা দেখছি। সুতরাং আমাদেরকে মৃত্যু এবং পরবর্তী জীবনের কথা ভেবে সঠিক মুক্তির পথের সন্ধান করতে হবে যেহেতু আমরা অসংখ্য পথে বিভক্ত, মতাদর্শে ভিন্ন, ধর্মে বিরোধী।

সঠিক পথ কামনা ও নানাবিধ প্রয়োজনে প্রার্থনা এবং সত্যিকার মুক্তির লক্ষ্যে আমাদের যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষ অহংবোধ ত্যাগ করা উচিত।

আমাদের আধুনিক জীবনের জটিল উন্মত্ততা, উদভ্রান্ততার অবসানে, সত্য, মুক্তির পথে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌তা'য়ালার মনোনীত নির্ধারিত পথপ্রাপ্তি, প্রত্যাশার সংকল্পে জীবনের কোন এক রাত্রির অর্ধাংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর (প্রয়োজন বোধে গোসল করে পবিত্র হয়ে) সম্পূর্ণ পরিষ্কার পবিত্র পোষাক পরিধান করুন। এক্ষেত্রে আপনার ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ই পোষাক পড়ুন। সম্পূর্ণ নিরব নিস্তব্ধ কোন স্থান, কোন কক্ষ বা এরূপ কোন স্থান যেখানে আপনি ব্যতীত অন্য কেহ নেই এবং আপনার কথা শুনতে পাবে এরকম কোন লোকজন নেই। এবং উক্ত স্থানে কোনরূপ প্রাণির ছবি/ প্রতিমা থাকবে না। এরূপ কোন স্থানে বসে পড়ুন না বসতে পারলে বা সুযোগ না থাকলে দাড়িয়ে থাকুন অথবা আপনার যে ভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় এবং দীর্ঘ্য সময় অবস্থান করতে পারেন সে ভাবেই অবস্থান করুন।

⏩ নীরব নিস্তব্ধ রাত্রে নির্জন সময় ব্যয় করার এই ইচ্ছা/ পরিকল্পনাকে আমি একটি প্রার্থনা রূপে/ একটি লক্ষ্যরূপে স্থির করতে চাচ্ছি! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ শক্তি দ্বারা সরল ভাবে কিছু প্রার্থনায় আমাদের চাহিদাকে আবেগানুভূতির উচ্ছাস, অশ্রুতে প্রকাশ করে আপন স্রষ্টা মুখি বিনীত হতে পারি।

যে কোন ধর্মের অনুসারীই আমরা হই না কেন সরল মনের অধিকারী হয়ে যদি আপনি এই প্রার্থনাটুকু করতে পারেন তাহলে নিজেই আত্মিক ভাবে সন্তুষ্ট হবেন! আপন স্রষ্টামুখি হয়ে কিছুটা সময় ভাববেন, বিনীত হবেন, সরল পথ কামনা করে স্রষ্টার সন্তুষ্টির তরে আপনার অহংবোধ-হীন আর্তি প্রকাশ অবশ্যই গর্বের বিষয়, লজ্জাজনক নহে। একজন মানুষ হিসেবে আপন স্রষ্টা/ মালিকের নিকট পৃথিবীর জীবনের নানা প্রয়োজন কামনা বাসনা অভিযোগ প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়াবলি উত্থাপন করা অবশ্যই ভালো বিষয়। মন্দ বিষয় হলো মানুষের নিকট প্রার্থনা করা উপস্থাপন করা!

সম্মানিত পাঠকের নিকট বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি, আমার বক্তব্যের উপস্থাপনা, বর্ণনা, করণীয় বাক্যগুলোকে কখনোই হুকুম/ নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ না করে পরার্মশক-অনুরোধ হিসেবে গ্রহন করার জন্য। আমি নিজেও একজন পাপী এবং দেবার মত কোন নৈতিক এবং সামাজিক পরিচয়ও আমার নেই।

মহান স্রষ্টা সমীপে ক্ষমা ও মুক্তি সহজ পথ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যই আমার এবং আপনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত!

স্থির ভাবে কিছু সময় বসার পর চোখ বন্ধকরে আপনার অতীতের (একবারে ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত যতটুকু আপনার স্মরণ আছে সেই সময় গুলো) সম্পর্কে ভাবতে থাকুন। আপনার জীবনের প্রতিটি বছরকে একটি করে পাতা হিসাবে কল্পনা করুন যেখানে আপনার জীবনের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ আছে। আপনার জীবনের দীর্ঘ সময় গুলোতে আপনার কৃত পাপ কর্মগুলোর কথা স্মরণ করুন যেগুলোকে আপনার ধর্ম সমাজ, আপনার মনুষ্যত্ববোধ পাপ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এহেন কর্মগুলো করা কতটুকু সঙ্গত হয়েছে ভাবুন! আপনি ভাবুন, আপনাকে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালা কি জন্য পাঠিয়েছেন এবং মৃত্যুর পর কোথায় যাবেন!

আপনার বাবা, দাদা বা স্বজনদের কথা স্মরণ করুন! যারা একসময় পৃথিবীতে বেচে ছিল এখন তারা পৃথিবী ত্যাগ করে অন্য কোথাও অবস্থান করছেন। অপনাকেও এক সময় এই পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। আপনি কিছু সময়ের জন্য সেই ভাবে মৃত্যুকালের সময়টা কল্পনা করুন যে ভাবে মৃত্যুকালে আপনার বাবা-মা বা স্বজনেরা উপস্থিত হয়েছিল। তাদের মৃত্যুর সময় তারা কিভাবে পৃথিবী ত্যাগ করেছে আপনি নিজের দ্বারা তা কল্পনা করুন। আপনার ধন সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র, সন্তান, ব্যাবসা, বাড়ী ইত্যাদি সব কিছু ছেড়ে পৃথিবীর ত্যাগ করার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন! আপনার ব্যাংকে টাকা আছে ব্যবসা আছে আপনার পাশে প্রাণপ্রিয় স্বজনেরা আছে কিন্তু আপনার কষ্ট ভোগ করার মতো বা আপনার ব্যাথায় ব্যাথিত হওয়ার মতো কেহই নেই। এরপর যখন আপনি মৃত্যুবরণ করলেন তখন দেখতে পাচ্ছেন আপনার স্বজনেরা চিৎকার করে কাঁদছে এবং উন্মাদের মতো আচরণ করছে। আপনার আত্মারূপি আপনি প্রিয় দেহটি থেকে বের হয়ে পাশেই দেহের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং স্বজনদেরকে দেখছেন।

আপনিও চিৎকার করছেন কষ্ট পাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাচ্ছেন, বলছেন কিন্তু তারা আপনাকে দেখছে না এবং আপনার কথাও শুনছে না। এরপর আপনার প্রিয় দেহটিকে গৃহচ্যুত করা হলো। আপনাকে আপনার ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সমাহিত করার আয়োজনে ব্যস্ত স্বজনেরা একসময় আপনাকে চির বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা করল। এরপর আপনি চির দিনের জন্য পৃথিবী ত্যাগ করে আপনার দৃষ্টির সামনেই উৎখাত হয়ে গেলেন। আপনার মৃত্যুকাল/ পৃথিবী

ত্যাগের বয়স যতই বাড়বে আপনার সমাহিতের স্থানে আপনার স্মরণে তেমন করেই স্বজনেরা আসবে যেমন করে আপনি আপনার স্বজনদের স্মরণে সমাহিতের স্থানে গিয়েছিলেন বা গিয়ে থাকেন।

এখন আপনি অসহায়ের মতো মৃত ব্যক্তিদের তালিকায়, মৃত ব্যক্তিদের মতো স্থানে অবস্থান করছেন। কেমন হলো অনাকাংখিত মৃত্যু নামক স্থানে উপনীত হয়ে?

আপনিতো কখনোই নিজেকে মৃত মনে করতেন না! এমনকি মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং মৃত স্বজনদের স্থানে আপনাকেও একদিন যেতে হবে এ বিষয়ে জানতেন কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবনাহীন অবস্থায় ছিলেন। আজ হঠাৎ করেই মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছে!

আপনি/ আমি দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সামগ্রীর পিছনে দৌড়িয়েছি। আমার লক্ষ্যই ছিল দুনিয়ার প্রতি, প্রতিষ্ঠা আর সম্মান লাভ যার মূল উদ্দেশ্য। দুনিয়ায় কখনোই মৃত্যুর পরবর্তী সময় সম্পর্কে ভাবিনি। আমার স্বজনেরা আমার মতো দুনিয়াতে দাপিয়ে বেড়িয়েছে একসময় তারা চলে গেছে আজ আমি চলে যাচ্ছি! কি আমার পরিচয়?

আমার বাবা-মা যদি আমাকে গর্ভে ধারণ না করতেন তাহলে আমি পৃথিবীতে আসতাম না এবং পৃথিবীর জীবন কাটিয়ে আজ মহা সমস্যার সম্মুখীনও হতে হতো না! আমি যদি পৃথিবীতে ভালো কর্ম করতাম মন্দ কর্ম পরিহার করতাম তাহলে আজ এত ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হতো না। আমার দেহটি আজ বিকল অবস্থায় পড়ে আছে। আমিতো 'দেহ' নই, আমিতো 'আত্মা'। আমাকে দেহ দেওয়া হয়েছিল আজ পৃথক করা হয়েছে ফলে আমার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। দেহের জন্য দেহের মাধ্যমে পৃথিবীতে যা কিছু উপার্জন করেছিলাম সবইতো পৃথিবীতে রেখে চলে এসেছি!

আমার আত্মাই সবকিছু, দেহ কিছুই নয়! এই যে এত মায়া এতো ভালোবাসা, সবইতো দেহ কেন্দ্রিক! আমার শরীর যদি না থাকত তাহলে কোন স্বজন আমাকে চিনতে পারতো না এবং আমার নিজস্ব কোন পরিচয়ও থাকতো না। আমার দেহের সৃষ্টি হতেই স্বজন সংসারে আমার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে এবং এরপর পৃথিবীতে আসার পর সবাই আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও ভালোবাসতে শিখি। আমার বাবা-মা আমার দেহকে সৃষ্টি করেননি তারা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। আমার মহান সৃষ্টিকর্তা

'আল্লাহ' আমার দেহ সৃষ্টি করেছেন বাবা-মার শরীরের অংশ দ্বারা। আমি আজ সেই মহান সৃষ্টিকর্তার দিকে চলেছি!

আমার স্বজনেরা আমার থেকে পৃথক হয়ে গেছেন! পৃথিবী এখন অতীত হয়ে গেছে! আমার দেহকে পরিচালনাকারি 'আত্মা' আজ নিজ স্বরূপে আমার নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে!

দেহ ব্যতীত আত্মার এই অবস্থা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম! আত্মার স্বরূপ উৎঘাটনের কোন ভাবনাই আমার ছিলনা!

আমার আত্মা কি আমার মা-বাবার শরীরের অংশ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে?

এটা কি আমার শরীর সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছে?

অবশ্যই না। আমার আত্মার সহিত আমার মা-বাবার দেহের বা শরীরের কোনই সম্পর্ক নেই এবং আত্মা এবং দেহ এক সঙ্গে সৃষ্টি করা হয়নি। যদি হতো তাহলো আজ আমার দেহ এবং আত্মার স্বতন্ত্র পরিণতি একই সঙ্গে প্রকাশ পেত না। আমার দেহ সৃষ্টির পর, আংশিক ক্ষুদ্র অবয়ব সৃষ্টির পর মহান 'আল্লাহ' আমার আত্মাকে দেহে প্রবেশ করিয়েছেন এবং আমি মানবশিশু রূপে দেহাচ্ছাদিত আত্মায় পৃথিবীতে এসেছি। আমার বর্তমান এই মৃত্যুর মাধ্যমে আমি মহান সৃষ্টিকর্তার নিকটি প্রত্যাবর্তন করিতেছি আত্মারুপে!

এ কেমন পথ? কি হবে আমার পরিণতি?

আমি আমার সারাটা জীবন দেহ কেন্দ্রিক অর্জন ব্যতীত আত্মা কেন্দ্রিক কোন অর্জন করতে পারিনি। আত্মা কেন্দ্রিক অর্জন, ইবাদত, সৎ কর্ম, ভালো কর্ম কোনটাই করতে পারিনি! আমার যাবতীয় অর্জন বস্তু কেন্দ্রিক, দেহ কেন্দ্রিক, স্থাবর সম্পদ! আমার পরিণতি এখন কেমন হবে? দুনিয়ার যেসব উপার্জন আমার মূল লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছিলো এসবতো বহন যোগ্য নয়! আমি আজ কি খাব, কাল কিভাবে উপার্জন করব এসব নিয়েই ভেবেছি! মৃত্যুর কথা কখনোই ভাবিনি! সময় পাই নি!

প্রকৃত কথা হলো আমি আমার নিজ 'আত্মা' সম্পের্কেই উদাস ছিলাম। পৃথিবীর দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে নিজ আত্মা বা আমি কেই চিনি নি। পচনশীল খোলস বা দেহকেই 'আমি' মনে করেছি! কি দুর্ভোগ আর দূর্ভাগ্য আমার! যে কোন সময় আমি সত্যিকার মৃত্যুর থাবায় প্রাণ বিসর্জন দিব এবং আমার সত্যিকার স্বরূপ উন্মোচন হবে। আমি আজ দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে আছি এবং আমার

এতটুকু সময় নেই আপন পালন কর্তার সমীপে বিনীত হওয়ার, তার নিকট প্রার্থনা করার এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে যথার্থ মঙ্গল জনক পথে অগ্রগামী হওয়ার! আমি আজ আমার ব্যস্ততম জীবনে সময় স্বল্পতায় ভোগছি এবং আত্মীয় স্বজন এবং পারিবারিক কর্তব্যবোধে উন্মাদ হয়ে আছি। জীবনের যথার্থ উপলব্ধি, যথার্থ স্বরূপ আহরণের নিমিত্তে ন্যূনতম সময়টুকুও আমার হয় না। আজ যে সময়টুকু আমি মহান 'আল্লাহ' স্বরণে, সঠিক পথের সন্ধানে, সঠিক উপলক্ষ্যে ব্যয়িত করার সংকল্পে বসে আছি বা দাড়িয়ে আছি (যেখানে একমাত্র আমার মহান স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ আমাকে দেখছেন না এবং আমার সম্পর্কে জানছেনও না) আমার এই সময়টুকু যেন যথার্থ ভাবেই উপলব্ধি যোগ্য হয়ে উঠে!

হে আমার সৃষ্টিকর্তা! আমার সময় কোথায়?

ব্যবসা-বানিজ্য, চাকুরী, স্ত্রী-সন্তান, সংসার এদের দায়িত্ব পালন করতেই জীবন কাটছে! আপনার ইবাদত! আপনার স্মরণ! কিভাবে করব? ভালো কাজ কিভাবে করব?

মিথ্যা না বললে ব্যাবসায় লাভবান হওয়া যায় না! সৎ পথে চললে অতীব কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। মিথ্যার মাধ্যমে অথবা হারাম পথের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা সহজ হয়ে পড়েছে! হালাল পথের উপার্জন দ্বারা সংসার প্রতিপালন করা কষ্ট সাধ্য! ভালোকে ভালো বলা, মন্দকে মন্দ বলাও অনেক সময় সম্ভব হয় না। চারিদিকে অনাচার আর পাপের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে।

হে আমার স্রষ্টা! যখন পৃথিবীর মানুষের দিকে তাকাই, যখন পৃথিবীর পরিবেশ সমাজ এবং মানুষদের অবস্থা দেখি তখন ইচ্ছে করে অধিক অর্থ উপার্জন করে অন্যদের মতো আনন্দপূর্ণ জীবন, ভোগ বিলাসিতায় লিপ্ত হই! কিন্তু সামর্থ হয় না, সাধ্য নেই, চেষ্টা করলে সফল হই বা হই না। চারদিকে অনাচার অবিচার, জুলুম, অন্যায় আর দরিদ্রের উপর নির্মমতার খড়গ নেমে এসেছে! আমি ইচ্ছা করলেও এসব হতে বাচতে পারছি না। চেষ্টা করছি মুক্তি পেতে! অর্থ, ভোগ, সম্মান ইত্যাদির পিছনে দৌড়িয়ে সামান্যই পাচ্ছি!

হে আমার স্রষ্টা! আমি যখন মৃত্যুর কথা ভাবার চেষ্টা করি, যখন আমার মৃত মা-বাবা বা স্বজনদের কথা ভাবি তখন নিদারুন কষ্ট পাই। কি হবে এই দুনিয়া দিয়ে! আমার মা-বাবা স্বজনেরাও তো সাজিয়ে ছিল সংসার! থাকতে চেয়েছিল এই পৃথিবীতে! তারা আজ এই পৃথিবী থেকে বিদায় হয়েছে আমিও এক সময়

তাদের পথের পথিক হবো! কেউ মরতে চায় না আমিও বাঁচতে পারব না। মৃত্যুদুত অবশ্যই আমাকে নিয়ে যাবে তার মতো করে! হায়! হায়! আমার কি পরিণতি হবে!

হে আমার স্রষ্টা-আল্লাহ! রাত্রিতে ঘুমাই সকালে উঠে কাজে যাই, আবার সন্ধ্যায়/ রাত্রিতে আসি; স্ত্রী-সন্তান এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করি। আপনার স্মরণ করার সময়, সাধ্য, অবস্থা কোনটাই হয়ে উঠে না! কি করব? আপনি আমার সৃষ্টিকর্তা, আমার আত্মীয় স্বজন হিতাকাঙ্খীরা কেউ আমার স্রষ্টা নয়, আমার রাষ্ট্র আমার সমাজ এবং এর কর্তারাও আমার স্রষ্টা নয়। অথচ আমি আপনার গোলাম হয়েও গোলামি করছি না। আবদ্ধ হয়ে পড়েছি স্বজন পরিজন সমাজ এবং রাষ্ট্রের। আপনাকে ভুলে গেছি, রাষ্ট্রের গোলামি করছি, সমাজের গোলামি করছি স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সামান্য কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে! এটাতো সঠিক কাজ করছি না! কিন্তু কি করব?

হে আমার স্রষ্টা! আপনি নভো-মন্ডল এবং ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা। আপনার দৃষ্টির সামনে অনু-পরিমানের চেয়েও ক্ষুদ্রতর কিছু অগোচর নয় আবার গ্রহ, নক্ষত্রগুলোও আপনার সামনে। আপনি আমার অতীত বর্তমান এবং সর্বশেষ ভবিষ্যত পর্যন্তও জানেন। আমার স্বামর্থ সম্পর্কেও জানেন! ভালো এবং মন্দ দু'টো পথের স্রষ্টা আপনি! আপনি সব জানেন!

আমরা কিভাবে কিছু কার্য কারণের দ্বারা ভালো বা মন্দ পথে ধাবিত হবো এবং তদানুযায়ী পৃথিবী এবং পরকালে কর্মফল ভোগ করব! হে আল্লাহ! আমার কোনই সাধ্য নেই আপনার ইবাদত করার, আপনার আনুগত্য করার; যদি না আপনি আমাকে সাহায্য করেন সামর্থ দেন! এবং নৈপথ্যে বিনীত হওয়ার ইচ্ছাটুকু প্রদান না করেন!

হে আল্লাহ! আমি অন্ধ, বধির এবং মুর্খ, আমার সাধ্য নেই জ্ঞান লাভ করে আপনাকে চিনব, জানব এবং মানবো!

হে আল্লাহ! আজ এই পৃথিবীতে ধর্ম এবং ধর্মের বিধান গুলোর বিবেধ ব্যাপকতর আকার ধারণ করেছে! আমরা অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্ম ঠিকমত পালন করছি না, ধর্মের সারাংশ অনুধাবন করছি না, বরং শয়তানের আনুগত্য করছি। এমন কি একটি ধর্মের মধ্যে অসংখ্য পথ বিদ্যমান! সঠিক পথের সন্ধান এবং অনুসরণ কিভাবে করব?

আমরা পৈত্রিক ভাবে প্রাপ্ত ধর্মের মত/ পথ অনুসরণ করছি মাত্র। ভুল বা সত্য কিছুই যথার্থভাবে জানিনা!

হে আল্লাহ! পৈত্রিক/ বংশগত ধর্ম বুঝিনা! যে ধর্মে চললে, যে বিধানাবলি মানলে আপনি সন্তুষ্ট হন এবং আপনার ইচ্ছার বাস্তবায়ন হয় আমাকে সেই ধর্মের অনুসারী করুন! আমাকে সেই ধর্মের যথার্থ অনুসরণ করার ব্যবস্থা করে দিন! মন্দ পথ এবং শয়তানের অনুসরণ করা থেকে আমাকে রক্ষা করুন! সঠিক সত্য ধর্মের বিধানাবলী আমার জানা এবং বোঝার ব্যবস্থা করে দিন।

আমরা প্রতিটি ধর্মাবলম্বীরা আমাদের অনুসরণীয় প্রতিটি ধর্মকেই সঠিক মনে করি এবং আমাদের করণীয় সামান্য ধর্মীয় আনুগত্যকেই আপনার সন্তুষ্টির উপলক্ষ্য মনে করি। সঠিক, ভুল যাচাই করার ক্ষমতা, সাধ্য, জ্ঞান, সময় কোনটাই নেই! কি করব! চরম হতাশায় ভোগছি!

ইসলাম ধর্মের মধ্যে অসংখ্য দল উপদল বিদ্যমান রয়েছে! সত্য এবং মিথ্যা যাচাই করার মত জ্ঞান কিভাবে অর্জন করব?

কর্ম বাদ দিয়ে সারাদিন গবেষণা আর বিতর্ক করলেও সত্য পথের সন্ধান করা সম্ভব নয় কারণ মন্দ এবং বিভ্রান্তি সত্যের সহিত একই রঙ্গে রঙ্গীত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে!

হে আল্লাহ! আমরা প্রতিটি মানুষেরা ধর্মীয় দিক থেকে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষী এবং ধর্মের যথাযথ অনুসরণ না করা সত্ত্বেও ধর্ম নিয়ে একে অপরের সঙ্গে অহেতুক সংঘর্ষের পথে এগুচ্ছি। সামগ্রিকভাবে এই পৃথিবীকে সংঘাতপূর্ণ করে তুলেছি!

হে আল্লাহ! আমার ব্যক্তিগত যাবতীয় সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, আমার আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করে দিন। যেন আমি পর-মুখাপেক্ষীতা থেকে মুক্তি পেতে পারি তার ব্যবস্থা করুন! পৃথিবীতে সুন্দর ভাবে বসবাস সহকারে আপনার আনুগত্য করতে পারি এবং অহেতুক ধর্মীয় সংঘাত হতে মুক্ত থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করুন!

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মুক্তি দিন অন্যায় ভুল ও অসৎ পথ হতে! এবং ন্যায় সঠিক ও সত্য পথে পরিচালিত করুন যেন আপনার সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারি। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা এবং সামান্য সময় দ্বারা আমাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে সঠিক ভাবে জানতে পারিনি এবং বুঝতেও পারিনি। আপনার

স্বীয় করুনা দ্বারা আমার জ্ঞান এবং ধর্মীয় বোধশক্তিকে সত্যিকার অর্থে সফল করে তোলুন! পৃথিবীতে আপনি লাখো লাখো মহা-পুরুষকে পাঠিয়ে ছিলেন, পৃথিবীস্থিত পুথিগত শিক্ষা ব্যতীত।

তাহাদেরকে পথ প্রদর্শক হিসেবে মানবজাতীর নিকট প্রেরন করেছেন এবং আপনার মহান কিতাব সমূহের প্রচার ও প্রসার করেছেন। অথচ তারা পৃথিবীর দৃশ্যমান শিক্ষায়, দৃশ্যমান উপযুক্ত, শিক্ষিত ছিলেন না!

হে আল্লাহ! পৃথিবীর বিলাস বহুল জীবন থেকে সরিয়ে আধুনিকতা বহির্ভূত গ্রাম্য পরিবেশে যদি আমার মঙ্গল হয় তাহলে আপনি আমার জন্য তার ব্যবস্থা করুন! তেমনি দারিদ্রতার নিষ্পেষনে যদি আমি আপনার বিরোধী এবং ধর্ম বিরোধী হয়ে উঠি তাহলে আমাকে প্রয়োজন মাফিক সংগত স্বচ্ছলতা দান করুন!

হে আল্লাহ! আমার ধন-সম্পদ অথবা দারিদ্রতা যদি আপনার ক্ষোভের কারণ হয় তাহলে আমার জন্য উপযুক্ত পন্থার ব্যবস্থা করুন!

হে আল্লাহ! আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও যথার্থ সঙ্গত মুসলিম হতে পারিনি। মুসলিম হলেও আমরা আজ আপনার প্রেরিত পথ প্রদর্শনকারী কিতাব কোরআন শরীফ পড়তে ও বুঝতে পারিনা। আমরা এতটা মুর্খ যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করলেও কোরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়ার জন্য, বুঝার জন্য চেষ্টা করি না!

বিজ্ঞানের পিছনে দৌড়াই অথচ মহাগ্রন্থ কোরআনের একটি বাক্যের বিজ্ঞানময়তা/ বিজ্ঞানমনস্কতা সারা পৃথিবীর সমুদয় বিষয়াবলির বিজ্ঞান দ্বারাও নিরুপন করা সম্ভব হবে না! আজ মুসলমানেরা যাদেরকে বিজ্ঞানী/ আবিষ্কারক বলছে তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষদের/ মুসলমানদের কোরআন রিসার্চ করেই বিজ্ঞানী/ আবিষ্কারক হয়েছে! ব্যর্থ মুসলমানেরা সেই আবিষ্কারের পিছনে দৌড়াচ্ছেন কোরআন শরীফ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবনাদর্শকে বাদ দিয়ে! এমন লজ্জাকর মুসলমানিত্ব দিয়ে কি হবে?

হে আল্লাহ! আমাদের কেহ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী বলে পরিচয় প্রদান করলেও নিজ নিজ ধর্মের প্রকৃত বিধান গুলোর গুঢ়ার্থ অনুধাবন করতে পরেননি এবং প্রকৃত ধর্মানুসারী হয়ে সত্যের অনুসরণও করতে পারেননি!

আমরা মহান স্রষ্টার সমীপে বিনীত না হয়ে প্রকৃত সত্যানুসারী না হয়ে আমাদের ধর্মের একাধিক গুরু/ সংস্কারকদের অনুসরণ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল ধর্মের বিরোধী কার্যকলাপই বাস্তবায়ন করছি।

হে আল্লাহ! আমরা ধর্মের অনুসারী হলেও পারিবারিক সূত্রেই ধর্ম পেয়েছি কোনরূপ শ্রম, ত্যাগ, সাধনা দ্বারা ধর্মের সন্ধান এবং অনুসরণ করিনি।

হে আল্লাহ! আমি কোন ধর্মের কথা বলতে চাইনা, যে ভাবে বলা হয়। আমি কোন ধর্মের দেখানো বোঝানো অনুসারী হতে চাইনা; যেমনটা আপনি চান না।

হে আল্লাহ! ধর্মগুলোর পার্থক্য করার জ্ঞান, বুদ্ধি, সাধ্য, ধর্মগুলো যথার্থ অতীত, ধর্মগুলো ভিত্তি সম্পর্কে আমার পরিপূর্ণ কোন জ্ঞান নেই। সেটা অর্জন করতে পারব না এবং হয়ত সম্ভবও নয়। আমি আপনার সন্তুষ্টি কল্পেই এই পৃথিবীতে বাচতে চাই। আমার নিজস্ব জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা সঠিক ধর্ম চিনে আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইনা। তবে আপনার সাহায্যে পৃথিবী এবং পৃথিবী পরবর্তী সময়ে কল্যাণকর সব কিছু চাই।

আপনার প্রতি বিনীত হওয়ার মাধ্যমে, আপনার প্রদত্ত জ্ঞান এবং সাহায্য দ্বারা আপনার নির্ধারিত ধর্মের আনুগত্য করতে চাই; শুধু মাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনে। আপনি আমার জন্য আপনার নির্ধারিত ধর্ম/ জীবন বিধান/ সন্তুষ্টির উপলক্ষ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে আমার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশে আমার দ্বারা আপনার আনুগত্য প্রকাশ করুন। আমি আপনার সাহায্যে, আপনার ভালোবাসায়, আপনার নির্ধারিত ধর্মের আনুগত্য এবং যথার্থ অনুসারী হতে চাই।

হে আল্লাহ! আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আপনার সমীপে দু'হাত উঠাচ্ছি, আপনার সমীপে সিজদাবনত হচ্ছি আপনি আমার উপরোক্ত প্রার্থনা গুলো মঞ্জুর করুন!

আমি কোন সভ্য লোক নই, আমি সুস্থ নই, আমি জ্ঞানী নই, আমি সম্পদশালীও নই, আমার অতীত হলো আমার পিতার নিক্ষিপ্ত বীর্য যা ত্যাগ করার পর আমার বাবা-মা দ্রুত গোসল করে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিজের অস্বস্থিতা দূর করেছেন। আমার বর্তমান সমস্ত কিছুই আপনার দান আমার দেহ সম্পদ অর্জন সমস্ত কিছুই আপনি প্রদত্ত। আমি শুধু আপনার দাস আপনার সৃষ্টি একটি প্রাণি, মানুষ আমার নাম। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং পথ নির্দেশ করুন!

হে আল্লাহ! আমাকে কাঁদতে দিন! কাঁদতে দিন! আমার মন ছোট অবস্থায় কত নরম ছিল বাবা-মা স্বজনদের সামান্য কথাতেই কাঁদতাম। কান্না দিয়েই স্বজদের

ভালবাসা আদায় করতাম। এখনও পৃথিবীতে কান্না দিয়ে, আবেগ দিয়ে অনেক কিছু জয় করা সম্ভব হয় যা অন্য কোন বিনিময় যোগ্য বস্তু বা সম্পদ দিয়ে সম্ভব হয় না। বড় বড় রাষ্ট্র প্রধানেরাও অনেক সময় আবেগ আর কান্নার মাধ্যমে বিচারালয় ও জনগণের সহানুভূতি আদায় করার চেষ্টা করে। আজ আমি বড় হয়েছি এবং বড় হওয়ার সাথে সাথে এতো অন্যায়কারী হয়েছি যে, আমার মহান স্রষ্টা যিনি আমাকে এক বিন্দুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তরল অংশ দিয়ে সৃষ্টি করে লালন পালন এবং বাচিয়ে রেখেছেন! তাহার সমীপে বিনীত হয়ে হাত উঠিয়েও কাঁদতে পারিছি না, ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারছি না! আমি কত জঘণ্যতম পাপি এটাই যথার্থ প্রমান!

আমি শয়তানের কতবড় অনুসারী যে, আমার প্রকৃত স্রষ্টার স্মরণে বিনীত হয়ে কাদতে পারিনা, পারছিনা। অথচ পৃথিবীর স্বার্থ সিদ্ধিতে পুলিশের লাঠির দুইটি আঘাত আমাকে নির্বোধের মতো কাঁদায়।

পৃথিবীর (সামান্য) বিত্তবান, ক্ষমতাবান লোকের সামনে গেলে কথা বলতে ভয় বোধ হয়, অথচ তারা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা/ সেনা কর্মকর্তার সামনে দাড়ালে এবং কথা বললে কম্পন এসে যায়। রাষ্ট্রপ্রতি, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের সামনে দাড়ালে, বড় বড় সামরিক কর্মকর্তাদের সামনে দাড়ালে এবং এমন কর্মকর্তারা তাদের উর্দ্ধতনদের সামনে মাথা নীচু করে দাড়িয়ে থাকেন। এমন মানুষেরা তাদের ক্ষমতায় কিছু সৃষ্টি করতে পারে না এবং প্রকৃত অর্থে মানুষেরা কোন ক্ষমতাবান নয় শুধুমাত্র দেহকেন্দ্রীক এবং মানষিক কষ্ট প্রদান ব্যতীত কোন ক্ষমতাই মানুষদের নেই। পৃথিবীর ক্ষমতাধর কোন শাসক প্রকৃত ভয়ের যোগ্য হতে পারেন না। কারণ তিনি একজন মানুষ ব্যতীত কিছুই নন। ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালী প্রতাপশালী ব্যক্তিরাও খান, মূলমুত্র ত্যাগ করার সময় প্রাণিদের মত জৈবিক অসহায় হয়ে পড়েন। মানুষেরা যখন যৌন কর্ম করে তখন দরিদ্র, ধনী, মানুষ এবং প্রাণিদের মধ্যে দৃশ্যমান কোন তফাত থাকে না। আমরা যাদেরকে ক্ষমতাবান, স্বামর্থ্যবান, ক্ষমতাধর শাসক শ্রেণি/ ব্যক্তিত্ববান মানুষ হিসাবে গন্য করি তারা বাস্তবিক অর্থে আমাদের মতই অসহায় স্বাভাবিক একজন মানুষ! শ্রেনী দ্বারা, অর্জন দ্বারা, বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানুষদের কেহ সম্মানিত, বিশিষ্ট হতে পারেন, সামাজিক বিশিষ্টতা থাকতে পারে কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানুষ কখনোই ভয়ের যোগ্য হতে পারে না। কিন্তু আমরা মানুষদেরকেই ভয় করা শিখেছি মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ'কে বাদ দিয়ে।

আত্মধারী মানুষদের জন্য এটা সম্পূর্ণরূপে আত্মিক- ব্যর্থতা, যাহা প্রানিত্বের বৈশিষ্ট্য বহন করে মাত্র!

হে আল্লাহ! আপনি মহা-ক্ষমতাধর, মহা-প্রতাপান্বিত, মহা-শক্তিশালী স্রষ্টা এবং মহা-শাস্তিদাতা! আপনাকে স্মরণ করে আমরা ভয় করি না। আপনি মানুষের চক্ষুর 'ভ্রু'র চেয়েও অতি নিকটে, আপনি সব কিছু দেখেন এবং সব কিছু শুনেন কিন্তু আপনাকে আমরা ভয় করি না।

আমাদের মন আজ কঠিন হয়ে গেছে অন্যায় করতে করতে অন্যায় পথে চলে, হারাম, অবৈধ উপার্জিত অর্থ খেয়ে মানুষের প্রতি অহংকারী এবং মিথ্যা মোহের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের 'আত্মা' আজ নিজ স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছে!

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার ভয়, আপনার যথার্থ স্মরণ করার মত মন দান করুন। হে আল্লাহ! আমি ক্ষুদ্র 'মানুষ' নামক প্রাণিকে যদি আপনার অকৃত্তিম ভালেবাসা এবং আপনার সন্তুষ্টিভাজন পছন্দের সৃষ্টি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিন! যদিও আমি কোন জঙ্গলে, মরুভূমির কোন তাবুতে, প্রত্যন্ত কোন গ্রামে, সাধারণ কোন গৃহে, আধুনিক সভ্য কোন সমাজে, কোন বৃক্ষ তলে, খোলা আকাশের নিচে, সংকীর্ণ কোন স্থানে অবস্থান করছি! এবং এতে আপনার অনুগ্রহ এবং করুনার কোন কিছুই ব্যায়িত হবে না।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তির সম্পদ হতে যদি একটি ডলার দান করা হয় তাহলে তার সম্পদ থেকে একটি ডলার কমে যাবে কিন্তু আপনার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের কিছু অংশ যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপর বর্ষন করেন তাহলে বিন্দু পরিমাণও কমবে না; এটাই আপনার অসীমত্বের গুণ। হে আল্লাহ! আমি নিকৃষ্টতম অপরাধী, পাপী, খুনি, এবং জঘণ্যতম ব্যক্তি হলেও আপনার ক্ষমা লাভের অযোগ্য হইনি বা হবোও না। আমাকে আপনার ক্ষমা, সৎ পথ প্রদর্শন দ্বারা আপনার প্রিয় হওয়ার সুযোগ দান করুন! ব্যবস্থা করুন!

হে আল্লাহ! আমি আজ মনুষ্যত্বের চিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ধর্মের ভিন্নতা, ধর্মের একাধিক দল-উপদল, ধর্মের অধার্মিক চিত্রায়ন, সত্যবিবর্জিত এবং শয়তান অঙ্কিত পথের একাধিক জৌলুসে আমি আজ সত্যিকার অর্থে ধর্ম বিমুখ এবং বাহ্যিক ভাবে ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে এক একটি ধর্মের অনুসারী হিসাবে দাবি করছি এবং পৃথিবীতে অন্যায় অহমিকা আত্মম্ভরিতার মাধ্যমে ধর্মের মূলনীতি আদর্শ এবং মর্মবানী হতে বিচ্যুত হয়ে আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের পথ খুজছি! এবং এমন দৃশ্যমান ধার্মিকতা দ্বারা আত্মতৃপ্তি খুজছি!

হে আল্লাহ! ভালো কর্ম, মন্দ কর্ম, ইবাদত আনুগত্য এক এক ধর্মে এক এক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রহনযোগ্যতা, যৌক্তিকতা, স্বার্থকতার বিচারে ধর্মগুলোর বিধানে ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের চিন্তা চেতনা দ্বারা সত্যকে অনুধাবন করতে পারিছি না। আমাদের অজ্ঞতা মুর্খতা আজ আমাদের মানবীয় স্বরূপ কে ঢেকে দিয়েছে। আমি আজ সত্যিকার মুক্তি চাই, সত্যিকার পথ চাই।

হে আল্লাহ্! আমরা জ্ঞানী এবং মুর্খ প্রত্যেকেই আজ আমাদের নিজ স্বরূপ সম্পর্কে উপলব্ধিহীন। আমাদের সামান্য কিছু মানুষ যারা সঠিক পথে আছেন তারাও আজ অধিকাংশের মতো মুর্খতায় নিমগ্ন হয়ে সত্যিকার ধর্মের উপর কালিমা লেপন করে ধার্মিক নাম নিয়ে উন্মাদের মতো, দুনিয়া লেলুপের মতো আচরণ করছেন। আমাদের এই পৃথিবীর শতশত কোটি মানুষদের মধ্যে কোটি কোটি বাহ্যিক ভাবে সমাদৃত ধর্মপ্রাণ মানুষেরাও আজ সত্য সঠিক ধর্মের মূল চেতনা, উপলব্ধি থেকে দূরে সরে এসেছেন। এমতাবস্থায় আমরা যারা মুর্খ আছি তাদের আলোচনা অনভিপ্রেত, অসঙ্গত বলে প্রতিয়মান হচ্ছে কেননা আমরা ধর্মহীনেরা বাহ্যিক ভাবেই ধর্ম হতে অনেক দূরে রয়েছি।

হে আল্লাহ্! অন্ধকার আমাবস্যা রাত্রির মতো এই সময়ে আজ অন্ধত্ব বরণ করে নিচ্ছে সবাই; বিনা বাক্যে।

▶▶ হে আল্লাহ্! আমার আত্ম-উপলব্ধির জন্য আমি নিজে আবৃতি করছি! আমাদেরকে যথার্থ উপলব্ধি করার সামর্থ দান করুন! স্ব-উপলব্ধির লক্ষ্যে গল্পটি যেন আমরা প্রত্যেকে যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হই!

প্রতিবেশি ৫টি বাড়ীর বাসিন্দা। একজনের নাম ওমর, মুসলিম। পার্শ্ববর্তী বন্ধু কৃষ্ণকান্ত, হিন্দু। তার পার্শ্ববর্তী বন্ধুটি জেমস, খ্রিষ্টান। পার্শ্ববর্তী বন্ধুটি বুদ্ধিদিপ্ত, বৌদ্ধ। পার্শ্ববর্তী বন্ধু কৃত্তিবাস, শিখ। এই পাঁচজন তরুন প্রতিবেশী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে ২/৪ বছরের ব্যবধান সাপেক্ষে। তাহাদের পিতাদের কেহ কৃষিকাজ, কেহ দোকানি, কেহ অল্প পয়সায় চাকুরিজীবী। উল্লেখ্য বিষয় হলো ৫টি পরিবার একটি গ্রামে বসবাস করে এবং ধর্মীয় ভাবে তারা প্রতিটি পরিবারই নিজ নিজ ধর্মের প্রতি ভীরু। কাকতালীয় সত্য হলো, ৫টি পরিবারের ৫জন পিতা বন্ধু বৎসল হিতৈষী হিসেবে জীবন যাপন করতেন এবং তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, তারা তাদের পুত্রদেরকে যথাক্রমে ধর্মীয় ভাবে ধার্মিক হিসেবে গড়ে

তুলবেন। সেই লক্ষ্যে তারা তাদের প্রিয় সন্তানদেরকে সাধ্যমত ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দিলেন।

পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর দেখা গেল ওমর মাওলানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কৃষ্ণকান্ত ব্রাহ্মন/ ঠাকুর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, জেমস্ যাজক/ প্রাদ্রি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, বুদ্ধিদিপ্ত ভিক্ষু হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং কৃত্তিবাস শিখ ধর্মের যথার্থ অনুসারী হিসেবে তার নিজ স্বরূপে উম্মোচিত হয়েছে।

তারা প্রত্যেকে তাদের স্ব-স্ব ধর্মানুসারীদের নিকট অনুসরণীয় ধর্মগুরু হিসেবে স্বীকৃত সমাদৃত হচ্ছে। সম্মানিত অবস্থানে/ আসনে অবস্থান করছেন

এহেন ধর্মভীরুদের মধ্যে বন্ধুত্ব বিদ্যমান থাকলেও তারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ৫টি ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সাধারণ দৃষ্টিতে তাদের ধর্ম তাদের জ্ঞান তাদের মধ্যে অজ্ঞাত একটি দূরত্ব সৃষ্টি করেছে যা তারা প্রত্যেকেই অনুধাবন করতে সক্ষম। এবং তারা প্রায়ই নিজেরা এ দিয়ে ভাবনায় বিচলিত হন। কিন্তু স্ব স্ব ধার্মিকতার কারনে, ধর্মীয় বাহ্যিক আবরনের কারনে তারা প্রত্যেকে ধার্মিক হিসেবে নিজ ধর্মকে একমাত্র অবলম্বন হিসেবে পৃথিবী এবং পৃথিবী পরবর্তী সময়ে মুক্তি পেতে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ এবং তাদের নিজ নিজ ধর্মের অনুসারীদের নিকট যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন হওয়ায় তাদের দ্বারা বন্ধুত্বকে বড় করে দেখা সম্ভব হয় না। প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম নিয়ে এবং নিজেকে যথার্থ সঙ্গত সঠিক এবং সৎ পথের অনুসারী, স্রষ্টার প্রিয় পাত্র হিসেবে কল্পনা করেন এবং তাদের বক্তব্য ও মতের স্বপক্ষে নিজ নিজ অর্জিত জ্ঞান, সাহস, দৃঢ় প্রত্যয় রাখেন।

হে আল্লাহ্! এই ৫টি ব্যক্তির স্ব স্ব শিক্ষা অর্জন ভবিষ্যৎ এবং প্রত্যয়ের স্বার্থকতা সফলতা এবং সত্য মিথ্যা সবই আপনি জানেন। আমরা যারা এই গল্প পড়ছি আমাদের বুদ্ধি এখানে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে বা আটকে আছে আমরা আর এগুতে পারছি না। কে আপনার প্রিয়? মুসলিম! হিন্দু! খ্রিষ্টান! বৌদ্ধ! নাকি শিখ!

কে? কি কারনে? এবং কেন? না কি সবাই? সবাই হলে পার্থক্য কেন?

একজন সঠিক হলে অন্যজনেরা কি অন্যায় করেছে?

ওমর, কৃষ্ণকান্ত, জেমস, কৃত্তিবাস, বৌদ্ধদিপ্ত, এই ৫ জন যদি নিজ নিজ ধর্মের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে যথার্থ ধর্মজ্ঞানী হয়ে থাকে বা জ্ঞান অর্জন করে থাকে

এবং নিজেকে যথার্থ সঠিক পথের অনুসারী হিসেবে দাবী করে তাহলে তাদের ভুল কোথায়?

হে আল্লাহ্! আত্ম উপলব্ধির জন্য বলছি! আমাদের বোধশক্তি সচল করুন! এবং ক্ষমা করুন!

উক্ত ধার্মিক প্রত্যেকের মধ্যে একটি বিরোধিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং ধর্মকে স্বীকার কারী জনগোষ্ঠীদের মধ্যেও একটি বিরোধিতার ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকে স্বাভাবিক থাকে সব সময়।

এভাবে প্রতিটি সমাজে ধর্মানুসারীরা পৃথক পৃথক ধর্মের কারণে একে অন্যের বিপরীত জীবনাদর্শে উজ্জিবীত হয়ে থাকেন। এর ফলে প্রিয় বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীত্ব এবং অন্যান্য সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায় ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত জনগোষ্ঠীদের নিকট।

ঘটনাক্রমে কোন এক সময় কোন কারণে ধর্মযুদ্ধ বেধে গেল বা যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধে রূপান্তরিত হলো! এমতাবস্থায় আমরা দেখলাম বা স্বাভাবিক ভাবে যা হওয়া সম্ভব বা হয়ে থাকে বা হতে পারে!

প্রিয় প্রতিবেশিরা, প্রিয় বন্ধুরা, প্রিয় হিতৈষীরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে গেল। যার যার সাধ্য সামর্থ অনুযায়ী দা, লাঠি বা অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র সহকারে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো/ তাদের স্ব-স্ব ধর্মানুসারী জনগোষ্ঠীদের সহিত তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলো অথবা দুইটি দল বা জোটে বিভক্ত হয়ে গেল। দীর্ঘ গলায় একে অপরকে আক্রমন করা শুরু করল। খোলা মাঠে মুসলিম বন্ধুটি জেহাদী মনোভাব এবং জেহাদের বক্তব্য দিতে লাগলো এবং পরকালীন মুক্তির সংকল্পে জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

এভাবে খ্রিষ্টান বন্ধুটি পরকালীন মুক্তির আশায় নিজের জীবনকে শেষ করে দেওয়ার জন্য প্রত্যয় জ্ঞাপন করল।

হিন্দু বন্ধুটি স্বর্গ লাভের আশায় তার মতো করে বক্তব্য দিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। বাকি দুই বন্ধুও লড়াইয়ে জীবন পন সংকল্পে প্রত্যয় জ্ঞাপন করছে। সংঘর্ষ বা যুদ্ধ করে জীবন দিলেও তাদের ভয় নেই কেন না প্রত্যেকে তার নিজ নিজ ধর্মের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি বা শান্তির ম্যান্ডেট/ নিশ্চয়তা পেয়েছে বা দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

এভাবে প্রতিটি ধর্মের ধর্মভীরু হতে শুরু করে সাধারণ ধর্মাবলম্বী সকল লোকজন প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ সমাজ ধর্ম অনুযায়ী আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে যাবে। এমনকি শুধুমাত্র বংশীয় ধর্মানুসারী ব্যক্তিরা পর্যন্ত স্ব স্ব ধর্মের পক্ষে অবস্থান নিয়ে পুণ্য লাভে অগ্রসর হবে।

হে আল্লাহ্! আমরা দেখলাম, দেখছি বা দেখবো বা সম্ভাব্য; প্রত্যেকে আজ জীবন দেওয়ার জন্য উন্মাদ এবং সে ব্যতীত অন্য চার বন্ধুকে অথবা তার বিপরীত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে, হত্যা করে পৃথিবীকে শান্তিময় করতে চায়! প্রত্যেকে তার নিজ ধর্মের প্রতিষ্ঠা চায় অন্য ধর্মের উৎখাত চায়!

হে আল্লাহ্! এই লড়াই! এই উন্মাদ মানষিকতার বদলে আমাদের প্রতিটি ধর্মাবলম্বী মানুষকে কি করতে হবে, কি বোধ শক্তি অর্জন করতে হবে তা আমরা আজ প্রত্যেকে ভুলে গেছি এবং অনেক দূরে ফেলে রেখে এসেছি। এমন কি আমাদের যারা ধর্মজ্ঞানী আছেন তারাও আজ আপনার মূল অভিপ্রায়ের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন। আমাদেরকে এই যথার্থ জ্ঞান দান করুন!

হে আল্লাহ্! ৫ বন্ধুর প্রত্যেকে যদি ধর্মজ্ঞান লাভ করার পর, পূর্ণতা প্রাপ্তির পর, আপনাকে যথার্থ ভাবে উপলব্ধি এবং যথার্থ ভাবে আপনার প্রতি অনুগত হওয়ার বোধ অর্জন করার নিমিত্তে বিনীত প্রার্থনা জানাতো!

ধর্মের মাধ্যমে আপনাকে/ স্রষ্টাকে চেনা জানার জ্ঞান অর্জনকে বড় করে না দেখে/ না ভেবে, আপনার সমীপে প্রার্থনা দ্বারা, আপনার দ্বারা, ধর্মের জ্ঞান লাভ এবং আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ধর্মকে অজর্ন করতো তাহলো অবশ্যই এমন হতো না।

তারা তো পৈত্রিক অর্জিত 'ধর্ম'কেই একমাত্র সঠিক মনে করে এর জ্ঞান লাভ করে প্রতিষ্ঠা অজর্ন করতে চেয়েছে, পৃথিবীতে এবং পরকালে।

অথচ সত্যটি হবে, সঠিক মনে করে অর্জিত শিক্ষাকে/ অর্জনকে যাচাই করা, মহান সত্তার অভিলাষে নিজেকে সমর্পনের মাধ্যমে নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জ্ঞান করে, পথের অন্ত:নিহিত পথ কামনা, অন্ত:নিহিত পথের অভ্যন্তরের সু-পথ কামনায় নিজেকে ব্যয়িত করা ...।

তারা যদি অন্ধভাবে ধর্মের বিধিবিধানের অনুসারী না হয়ে চক্ষুষ্মানের মতো ধর্মের বিধানকে যথার্থভাবে অনুসরণ করতো তাহলে তারা অনেকেই সত্য ধর্মে চলে আসতো। কারণ 'ধর্ম' কখনোই চক্ষু বন্ধ করে অন্ধের মতো হিতাহিত জ্ঞান

হারিয়ে ধর্মানুসারী/ ইবাদত করার নির্দেশ দেয় না (কারণ সত্য ধর্ম সবসময় উম্মোচিত থাকে তার স্বরূপ প্রকাশের লক্ষ্যে)। সেই সমস্ত নাম মাত্র/ দেখানো/ প্রকাশিত ধার্মিক ধর্মগুরুরা এবং ধর্মানুসারী সরলপ্রাণ বলে পরিচয়দানকারী মূর্খ মানুষেরা যদি মহান একক স্রষ্টার সমীপে বিনীত হতো এবং একমাত্র স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে নিজ দেহ এবং আত্মাকে ব্যয়িত করার মাধ্যমে যথার্থ ধার্মিক হওয়ার জন্য ব্যাকুল, উন্মাদ, অশ্রুসিক্ত আর্তি হাহাকার তাদের মধ্যে কাজ করতো তাহলে কখনই এহেন ধর্মানুসারীদের মধ্যে এমন দৃশ্যমান বিরোধ বা যুদ্ধ তৈরী হতো না বা কখনো হবেও না।

তবে হতো বা হওয়া সম্ভব শয়তানের সঙ্গে বা শয়তানের দলের সঙ্গে যারা স্পষ্টত জানা বোঝার পরেও মন্দের অনুসারী হয়ে ন্যায় সত্য ও সঠিক পথের বিরুদ্বাচরণ করে। কেননা একমাত্র শয়তানের এবং তার মন্দপথের কাজ হলো সৎ পথের এবং সেই পথে ধাবিত হওয়া ধার্মিক ব্যক্তিদের মাঝখানে বিরোধিতা/ বাধার ক্ষেত্র হয়ে দাড়ানো। এমতাবস্থায় মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র বান্দাদের সঙ্গে শয়তান ও তার অনুসারীদের লড়াই বা সত্যের সহিত মিথ্যার লড়াই হতো।

বিভিন্ন ধর্মের লোক দেখানো/ বংশীয়/ অ-যথার্থ অনুসারীদের মধ্যে অন্ধত্বের কারণে কোন লড়াই হতো না।

বিভিন্ন ধর্মানুসারী ব্যক্তিরা যদি নিজেদের নিজ নিজ পৈত্রিক অর্জিত ধর্মে বর্ণিত 'স্রষ্টা' সম্পর্কে জ্ঞান/ শিক্ষা লাভ করার পর অর্জিত শিক্ষাকে যাচাই, ঝালাই, বিশুদ্ধকরার মানষে সৎ সংজ্ঞত সঠিক ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে মহান স্রষ্টার জন্য যথার্থ প্রযোজ্য সঙ্গত যৌক্তিক পরিচয় লাভ করার জন্য বিনীত অন্তরে আর্তনাদ করতো নির্জন নিভৃতে এবং সত্যিকার অর্থেই মহান স্রষ্টার পরিচয় লাভই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকতো তা হলে মহান স্রষ্টা যিনি সবসময় সব কিছু দেখেন শুনেন জানেন এবং সর্বত্র বিরাজ করেন (প্রায় প্রতিটি ধর্মে বিভিন্ন ভাবে এই মর্মবাণী আলোচিত হয়েছে) তিনি অবশ্যই এমন সৃষ্টিকে তার পথে চালিত করতেন এবং আলোর ব্যবস্থা করতেন।

ধর্মজ্ঞান লাভকারী ব্যক্তি যদি তাদের ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কে সত্যানুসন্ধানি ভাবনায় ব্যাকুল হতো তাহলে অবশ্যই তারা যথার্থ ধার্মিক হতো এবং সত্যিকার ধর্মে ফিরে আসতো এবং অসৎ অসঙ্গত, অমানবিক ধ্বংসাত্বক, মানবিকতা বিরোধী ধর্মাচার, থেকে বিমুখ হতো বা এমন ধর্ম পরিত্যাগ করতো।

হে আল্লাহ্! কম বা বেশি ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তিগুলো যদি সামাজিক আচার বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পর এর মূল সারাংশ, ভাবার্থ, উপযোগিতা নিয়ে ভাবতো এবং সত্যানুসন্ধানি হতো তাহলে সামাজিকতা লৌকিকতা, পৈত্রিক অর্জিত/ পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত অনেক কিছুতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, বর্জন করত এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত হতো।

▶▶ আমাদের দৃশ্যমান অধিকাংশ ধর্মজ্ঞানীরা আজ ধর্মজ্ঞান লাভ করে জ্ঞানী হয়ে ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন! কোন প্রকার বোধ শক্তি সত্যানুসন্ধানী ভাবনা তাদের মধ্যে কাজ করে না। অনেকটা গাধার ন্যায় পুস্তক বহন করে যাচ্ছেন। গাধা পুস্তক বহন করলে যেমন তার কোন লাভ হয় না, আলোতে আলোকিত হয় না, তেমনই অন্য বোঝা বা পুস্তকের বোঝা একই বোধ হয় তেমনি আজ আমরা সত্য পথের অনুসারীরা পুস্তকের ন্যায় ধর্মকে এবং গাধার ন্যায় নিজেরা পথ চলছি। এমতাবস্থায় ধর্ম আমাদের কোন কল্যাণে আসছে না।

যে পরকালীন কল্যাণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা আমরা আশা করছি তা মূলত মহান মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে কেননা তার সৃজিত অন্যান্য গাধারাও আমাদের মতো লাকড়ি, চাউল, ডাউল ইত্যাদি বহন করছে নিজেদের অজ্ঞাতসাড়েই। সুতরাং গাধাত্ব ত্যাগ করতে হবে! এটিই বিষয়!

আমাদের অধিকাংশ ধর্মজ্ঞানীরা ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পিছনে ধর্মকে, ধর্মীয় জ্ঞানকে ব্যাবহার করছেন এবং সত্যিকার অর্থে তারা সাধারণ অধার্মিক ব্যক্তিদের চেয়েও নিম্নে পর্যবসিত হচ্ছেন। তারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েও অর্জিত জ্ঞান দ্বারা নিজ নিজ ধর্মের ভিত্তিমূলে প্রবেশ করার এবং গুঢ়ার্থ অর্জন করার জন্য একমাত্র একমাত্র একমাত্র মহান মালিকের প্রতি কোনরূপ স্বার্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, নির্ভেজাল মন নিয়ে আর্তনাদ করেন না!

শুধুমাত্র মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করার নিমিত্তে নিজেকে অসীম ক্ষমতাধরের সমীপে বিনীত করেন না! লৌকিকতা, দৃশ্যমান সামাজিককতা ব্যক্তি স্বার্থ, প্রভাব প্রতিপত্তি সম্মান ইত্যাদি হীন কিছু অর্জনের পিছনে আমাদের ধর্মজ্ঞানীরা নিজ নিজ অর্জনকে ব্যায়িত করছেন। এমতাবস্থায় দৃশ্যমান অধার্মিক, জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা এবং জ্ঞানবান ব্যক্তির মধ্যে মূলত কোন প্রকার পার্থক্য থাকছে না। আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাচ্ছি মানুষদের বিভিন্ন শ্রেণির ন্যায় দৃশ্যমান ধার্মিক শ্রেণিকে, যারা বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং মিথ্যা অন্তসার শুন্য ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী এবং সত্যিকার ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেকে তাদের নিজ

নিজ ধর্মের ক্ষতি করছেন এবং এক্ষেত্রে একমাত্র বিশাল ক্ষতি হচ্ছে সত্যিকার ধর্মটির এবং তার অনুসারীদের।

আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাচ্ছি সামগ্রিক ভাবে সর্বনাশা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে এবং মন্দ পথের সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমাগত এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে সেই পথটি যে পথটি নভোমন্ডল এবং ভূমন্ডলের স্রষ্টার নির্দেশিত।

যে পথটি মহান সত্যিকার স্রষ্টার, সত্যিকার ধর্মের মাধ্যমে মানুষের সত্যিকার কল্যাণের নিমিত্তে পৃথিবীতে প্রদর্শিত হয়েছে, সত্যিকার ভাবে যে ধর্মটি মহান স্রষ্টার অনুমোদন নির্ধারণ নিয়ে পৃথিবীতে স্রষ্টার সন্তুষ্টির উপলক্ষ্য হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌তায়ালা তার আপন বিধানাবলীকে সমুন্নত করবেনই! হয়তো আমাদের মতো স্বার্থবাদীদের শাস্তি দিয়ে, ধ্বংস করে, পাপের সাজা দিয়ে, অধার্মিক মুর্খদের, সন্তানদের দ্বারা তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন, তার মনোনীত বিধানকে সমুন্নত করবেন!

আমরা কি দেখছিনা! আমরা কি বুঝতে পারছি?

▶▶ আমরা আজ নিজ ধর্মের অভ্যন্তরে নানা প্রকার মতাদর্শে পৃথক হচ্ছি, মনগড়া মতবাদ, বিভ্রান্তিতে প্ররোচিত হচ্ছি এবং কোন প্রকার বিনয় নম্রতায় সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহর স্মরণে বিগলিত হয়ে কাতরতা প্রকাশ করছি না; সত্য মিথ্যা যাচাই করছি না! সর্বত্র বিরাজমান স্রষ্টায় বিনীত হয়ে সঠিক পথের সাহায্য কামনা করছি না!

মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সুন্নি মাজহাবি, লা-মাজহাবি, পীরবাদী পীর বিরোধী ইত্যাদি মতভেদের অনুসারী রয়েছে। এর মধ্যে ভন্ড পীর মাজারি ব্যবসায়ীদের দাপট দক্ষিণ এশিয়ায় বেশী। কেহ তাবলিগকে পছন্দ করেন কেহ বিরোধীতা করেন। তাবলীগের মধ্যেও বিভক্তি! বিভক্তরা আজ একে অপরকে ধ্বংস করার বক্তব্য দিচ্ছে, মাথা ফাটাচ্ছে!

সর্বনাশা অহমিকা, অজ্ঞতা আর বিনম্রহীনতা আজ মুসলমানদেরকে আত্ম ধ্বংসে নিপতিত করছে। দল উপদলে বিভক্ত মুসলমানদের মধ্যে আজ নেই কোন ঐক্য এবং সম্পৃতি। মিলাদ কিয়াম ইত্যাদি পীরবাবাদের দ্বারা অনেকেই আজ ইসলামের মূলনীতি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের অজ্ঞাত সারে। সুফিবাদ আর চার তরিকার কথা বলে পরীরেরা কোটি টাকার গাড়ীতে চলেন। অট্টালিকায়

বসবাস করে নবী প্রেমের বুলি আওড়ান আর মুর্খ মুসলমানেরা এদের পিছনে দৌড়াচ্ছে কোরআন সুন্নাহ রেখে। চাই মুক্তি! চাই মুক্তি!

এজন্যই এই পথে এসেছি এবং আমার পথই সঠিক সত্য! আমার নিকট কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা আছে! অথচ এই যে, ভেদাবেদ ও বিরোধীতা কি জন্য!

উত্তরে সবাই বলবে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই! আমাদের স্বপক্ষে প্রমান রয়েছে! ইত্যাদি! ইত্যাদি!

বিভক্ত মানুষদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই এত দলাদলির দরকার নেই! চলুন! আমরা প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাই, কান্নাকাটি করে তার নিকট সত্য পথে চলার জন্য সাহায্য চাই। চলুন আমরা নির্জন নিভৃতে আল্লাহর নিকট দুই ফোটা চোখের পানি ফেলে সন্তুষ্টি জনক সত্যিকার পথ কামনা করি যেহেতু আমরা সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দলাদলী করছি।

কিন্তু মহা চ্যালেঞ্জ হলো এটা আপনার আমার মতো মিথ্যাবাদীরা দুই/ চার জন ব্যতীত অধিকাংশই পারবেন না! কারণ একান্ত নিভৃতে আল্লাহর স্মরণ করে নিরাকার আল্লাহকে স্মরণ রেখে, জন মানুষের আড়ালে কাঁদবেন আর সহজ সরল পথ প্রার্থনা করবেন, এটা খুবই কঠিন। তবে আল্লাহ চাইলে সহজ। প্রমাণ করে দেখুন এই মুর্খের কথাটি। আপনার নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা থাকলে সেই টাকার পুরোটাই দান করা সহজ হতে পারে কিন্তু আল্লাহর স্মরণে একা একা পাঁচ ফোটা চোখের পানি ফেলা মহাকঠিন এবং সুপথ প্রার্থনায় কাঁদা আরোও কঠিন। চলুন, আমরা চেষ্টা করি!

আমাদের প্রত্যেকে যদি কাম ক্রোধ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ ইত্যাদি হতে মুক্ত হওয়ার জন্য স্রষ্টামুখি হয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জনের নিমিত্তে চেষ্টা করি তাহলে কখনোই আমাদের মধ্যে বা বর্ণিত ধর্মানুসারীদের মধ্যে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে কোন প্রকার কলহ বা সংঘাত দেখা যেতো না বা যাবে না। বরং ধর্মানুসারিদের মধ্যে/ যাদের মধ্যে এসব না থাকতো, বা মানবিক অর্জনের অভাব থাকতো, এসবের শুন্যতায় ধর্মানুসারীরা নিজে নিজেই বিপরীত ব্যক্তির, ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতো এবং মিশে যেত একাত্ততায়, মহা-সত্যের আলোতে।

আমরা কি বুঝতে পারছি না?

তারপরও কিছু সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। যেমন শয়তান সর্বপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি হওয়ায় নিকৃষ্ট কর্মে নিযুক্ত না করতে পেরে কারও কারও দ্বারা অন্যদেরকে ধ্বংশ করার চেষ্টা করতো। এমতাবস্থায় যে সংঘাতের সৃষ্টি হতো, তা হতো সত্য-মিথ্যার লড়াই, শয়তানি কর্মের বিরুদ্ধে লড়াই। অজ্ঞতা, মুর্খতা, ধার্মিকতার লড়াই আমরা দেখতাম না।

আমাদের দ্বারা আমাদের নিজ "মহান-ধর্মের" অপ-প্রচার হতো না। আমাদের মহাসত্য ধর্মের যে সর্বনাশ আমরা করছি, আমার মতো ব্যক্তিদের দ্বারা এসব কাজ হতো না।

হে আল্লাহ্! নির্বোধ, সবোধ প্রত্যেকেই আমরা আজ বিচ্যুত, আমাদেরকে আজ বিচ্যুতি হতে রক্ষা করুন!

হে আল্লাহ্! আমরা অধার্মিক/ ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে/ যথাযোগ্য ধার্মিক হওয়ার ব্যাবস্থা করুন! যথার্থ সংগত মানুষ হওয়ার যথার্থ ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ করুন!

হে আল্লাহ্! পৃথিবীতে আপনার নির্ধারিত যে ধর্মটি আছে, যে বিধানাবলী মানুষদের জন্য একমাত্র কল্যাণকর, যে বাক্যাবলি একমাত্র স্বার্থক, সফল, সঙ্গত-সত্য, যে বাক্যাবলির সামান্যও পরস্পর বিরোধী নয়, যে বিধানাবলীর সামান্যও মানুষের জন্য অমঙ্গলজনক নয়, যে বিধানাবলী এবং বাণী সমূহ দ্বারা পৃথিবীর মানুষের, সমাজের এবং সামগ্রিক পৃথিবীর কল্যান হওয়া সম্ভব, যে বিধানাবলী এবং পথ নির্দেশক আপনার সমুদয় সৃষ্টি জগতের জন্য কল্যাণকর, যার মধ্যে না আছে কোন অসঙ্গতি, ত্রুটি, মিথ্যা, এবং না আছে কোন প্রকার অযৌক্তিকতা, সেই মহান ধর্মের, মহান পথের একাগ্র অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন!

হে আল্লাহ্! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যে মানুষটি দ্বারা মহান চরিত্রের, মহানুভবতার শিক্ষা পৃথিবীবাসি মানুষদের জন্য শিক্ষনীয় হিসেবে স্থাপন করেছেন! যে মহান ব্যক্তির সমগ্র জীবনাদর্শ পৃথিবীবাসি মানুষদের জন্য একমাত্র মঙ্গল জনক আদর্শ হতে পারে সেই মহান ব্যক্তির যথার্থ অনুসরণ অনুকরণ করার মতো মনোবল এবং স্বামর্থ দান করুন!

হে আল্লাহ্! এই পৃথিবীতে যে মানুষকে আপনার প্রিয় দাস হিসেবে প্রমাণিত স্থায়ী স্বীকৃতি দিয়েছেন আপনার মহান সৃষ্টি, মহান সেই আত্মার যথার্থ অনুসারী করে তোলুন!

হে আল্লাহ! আমাদের অন্ধত্ব ক্ষুদ্র জ্ঞানার্জনের অহমিকা দূর করে সত্যানুসন্ধানী বিনীত আত্মায় পরিশুদ্ধ জীবন দান করুন!

হে আল্লাহ্! অন্ধত্বের কারণে আমরা মানুষেরা যেন নিজের প্রতি, একে অপরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে অস্ত্রধারণ না করে, মিথ্যা অসঙ্গত অন্যায়, অমানবিকতা, অশালীনতা এবং সর্বোপরি শয়তানের নিষিক্ত ডিম্বানু এবং প্রজননকৃত বংশধরদের বিরুদ্ধে এবং বংশবিস্তারকৃতদের সৃজিত মতবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারি এবং এই পৃথিবী থেকে তাদেরকে সমূলে উৎখাত করতে পারি সেই দৃঢ় প্রত্যয়বোধ আমাকে, আমাদেরকে দান করুন!

হে আল্লাহ্! আপনার ভালোবাসা অসীম মমত্ববোধের বিধানাবলীর বাণী যেন এই পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে মিথ্যাকে পরাভূত এবং বিলিন করে দেয় তার ব্যবস্থা করুন!

হে আল্লাহ আপনার সৃষ্ট জগতে আজ শয়তান ও তার মতবাদ মতাদর্শ প্রচারিত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপনার সৃজিত পৃথিবীতে ধ্বংশের দামামা বাজাচ্ছে! আপনি আমাদেরকে আপনার দলভূক্ত করে শয়তানের মোকাবেলায় ব্যবহার করুন!

হে আল্লাহ্! আমরা আপনার সমীপে বিনীত হওয়ার মাধ্যমে সার্বজনীন কিছু ভালো কর্ম এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট অর্জন করার দৃঢ় শপথ/ প্রত্যয় ব্যক্ত করছি, যা আমাদের জীবনের, আমাদের সমাজের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। এবং এর মাধ্যমে আমি বা আমরা মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিকট আশা করতে পারি/ কামনা করতে পারি যার মাধ্যমে (নিম্নোক্ত কিছু অর্জনের মাধ্যমে) তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিবেন।

১. মিথ্যা কথা বলব না। প্রয়োজন বোধে কৌশল অবলম্বন করে মিথ্যা হতে মুক্ত থাকার চেষ্টা করব এবং মিথ্যা কথা যেন বলতে না হয় সে ব্যাপারে পূর্ব থেকেই সতর্ক থাকব।
২. অন্যায় অন্যায্য পথে কোন অর্থ উপার্জন করব না। প্রতারণা, কৌশল চক্রান্ত এবং অধিক মুনাফা লাভের বশবর্তী হয়ে কোন উপার্জনের দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেব না। হে আল্লাহ! আমার উপার্জনের পন্থা অন্যায্য, মন্দ এবং হারাম! আমি সংকল্প করছি এবং চেষ্টা করছি এবং ঘৃণা করছি আমার অর্থ উপার্জনের পথকে সহজ করে সঠিক পথে বৈধ অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিন।

৩. হে আল্লাহ! আমার নিকট যথার্থ প্রার্থনাকারী, সাহায্য কামনাকারী কাউকে শুন্য হাতে ফিরিয়ে দেব না। একটি পয়সা হলেও দান করব এবং সাহায্য কামনাকারীকে ন্যূনতম হলেও ভালো পরামর্শ প্রদান করব/ প্রয়োজনে বিনীত ভাবে ফিরিয়ে দেব।
৪. আমি নিজেকে ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র সাধারণ একজন মানুষ হিসাবে মনে করব, মানুষদেরকে ভালবাসবো এবং মহান আল্লাহ্‌তায়ালার সৃজিত অন্যান্য প্রাণিদেরকে ভালবাসবো। ভালো কথা, ভালো আচরণ পরোপকার দ্বারা মানুষের মঙ্গল করার চেষ্টা করব। আমার দ্বারা যেন অন্য কোন মানুষের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। ন্যূনতম হলেও মনে প্রাণে ভালো কামনা, ভালো ধারনা পোষন করার চেষ্টা করব।
৫. সত্য সঠিক যথার্থ সঙ্গত কোন বিষয়কে সত্য সঠিক সঙ্গত বলেই মনে করব এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করব। সত্যকে মিথ্যার দ্বারা এবং যৌক্তিক বিষয়কে অসংগত আবরণে উপস্থাপন করব না এবং সমর্থনও করব না। সারা পৃথিবীর মানুষ যদি সত্যকে মিথ্যা বলে, অন্যায্যকে ন্যায্য বলে, তাহলেও আমি সত্যকে সত্য বলব এবং বিশ্বাস করব।

হে আল্লাহ! অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার এবং মানুষের প্রতি নির্যাতনের যে দৃশ্যাবলী আমি দেখছি বা জানছি তাকে ঘৃণা করার মতো মন দান করুন! ভালো কামনা করা ভালো মনোভাব রাখা, সত্য ও সঙ্গত কথা বলা, সঠিক পথে বৈধ অর্থ উপার্জন ও বৈধ পথে ব্যয় করা এবং মানুষের উপকার করার দৃঢ় প্রত্যয় দান করুন!

হে আল্লাহ! আমরা বিভিন্ন ধর্মে এবং ধর্মের অনুসারী হিসাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হই না কেন আমরা সঠিক পথের প্রার্থী হিসাবে উপরোক্ত কর্মগুলো আমাদের দ্বারা অর্জন করার সক্ষমতা, সাহায্য এবং অনুগ্রহ করুন!

হে আল্লাহ! আমাকে সরলতা পূর্ণ চারিত্রিক মাধুর্য এবং অন্যান্য সকল মানুষ এবং প্রাণিদের প্রতি ভালোবাসা পূর্ণ পরোপকারী হৃদয় দান করুন!

আপনি আমার সামনে পিছনে ডানে, বামে, উপরে, নিচে সবর্ত্র বিরাজমান। আমার শরীরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষগুলোকে দেখছেন কিভাবে আমি কথা বলছি এবং মনে কি ভাবছি! আপনি আমার অতি নিকটে। সৃষ্টির কোন দৃষ্টি আপনাকে আয়ত্ব করতে পারে না কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুকে বেষ্ঠিত করে

আছেন। আপনি সব সময় আমাকে দেখছেন এই ধারণাটুকু যেন করতে পারি এবং আপনার স্মরণ যেন সবসময় করতে পারি সেই স্বামর্থ্য দান করুন!

▶▶ উক্ত আবেগ অনুভূতি নিংড়ানো ভাব বাক্য গুলোর সারাংশ আপনি আপনার মহান স্রষ্টা, মালিকের প্রতি নিবেদন করবেন! সত্য সঠিক পথ প্রাপ্তিই আপনার প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্য। দৃঢ় ভাবে আশা করা যায় বিনয় নম্রতা সহকারে যথার্থ মনে প্রাণে উক্ত বাক্যগুলোর সারাংশ, যথার্থভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালার নিকট করুনা কামনা করলে এবং এই প্রার্থনায় থাকবে না কোন কৃত্রিমতা, থাকবেনা অন্য কোন উদ্দেশ্য। এমন প্রার্থনাকারীকে মহান আল্লাহ অবশ্যই তার অনুগ্রহের পথে পরিচালিত করবেন। মৃত্যুর পূর্বে হলেও মহান আল্লাহ আপনার/ প্রার্থনাকারীর মনের ভাব অনুযায়ী সরল সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। জীবনের নূন্যতম দুই, তিনটি ঘন্টা এরূপ প্রার্থনা মহান আল্লাহতায়ালার স্মরণে ব্যয় করার চেষ্টা করুন। মহান আল্লাহতায়ালা তার নির্ধারিত পথে আমাদেরকে পরিচালিত করবেন আমাদের ধারণাতীত বোধের বাইরে। যদিও আপনি কোন কয়েদ খানায় রয়েছেন, যদিও আপনি দাস-দাসির মতো জীবন যাপন করছেন যদিও আপনি এমন কোন কাজে লিপ্ত আছেন যা সম্পূর্ণ অমানবিক ও দুর্দশাগ্রস্থ কর্মজীবন আপনাকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং মানব জীবন ও জগতের যত দূর্বোধ্য অন্ধকারেই আপনি থাকুন না কেন! এই ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত থাকুন!

আপনি যে ধর্মের অনুসারীই হোন না কেন একজন মানুষ হিসেবে স্রষ্টা আল্লাহর নিকট বিনীত হওয়া লজ্জার নয়, ভাগ্যের বিষয়! যদি নিজেকে সঠিক এবং একমাত্র সঠিক ধর্মের অনুসারী হিসাবে কঠিন ভাবে বিশ্বাস করেন তাহলে এরূপ প্রার্থনার সারাংশ/ প্রার্থনা, কাতরতা আরও বেশি করা উচিত, থাকা উচিত। কারণ পৃথিবীতে সামান্য পথ-প্রাপ্তরা এবং পথ-প্রাপ্তরা পথ-ভ্রষ্ট হয়েছেন বেশি। একমাত্র পথ-প্রাপ্তরাই পথ-ভ্রষ্ট হতে পারেন! পথ-ভ্রষ্ট, মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিতদের, পথ-ভ্রষ্ট হওয়ার সুযোগ নেই বা প্রয়োজনও নেই।

কিছু কিছু মুসলিম আলেম এবং ধর্মীয় অনুশাসন মান্যকারী (সামান্য), সামান্য জ্ঞান প্রাপ্তদের মধ্যে এত অহমিকা, এত হিংসা বিদ্বেষ, যাহা সাধারণ ধর্মানুসারী ব্যক্তিদের মধ্যেও নেই (সম্ভবত)। হিংসা বিদ্বেষ অহমিকা, জ্ঞানের আত্মম্ভরিতা ধ্বংশের পথে এগিয়ে নিলেও আমাদের সামান্য জ্ঞানবানেরা অতীত যথার্থ

ব্যক্তিদের অনুসরণ করে আত্মার চিকিৎসায় এগুচ্ছেন না! এমন কি আমরা চেষ্টাও করছি না।

অথচ মহান আল্লাহতায়ালার বক্তব্য হচ্ছে "বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের অধিকারীরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে"। "শুদ্ধ হৃদয় ব্যতীত যারা তার মালিকের নিকট উপস্থিত হবে তারাই ক্ষতি গ্রস্থ হবে"।

আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলিমরা এবং ধার্মিক পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তিদের অধিকাংশই আজ আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে যথার্থ ভাবে অনুসরণ করছি না। তার জীবনাদর্শের শিক্ষা এবং জীবন বিধানের অনুসরণ করে পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার মাধ্যমে যথার্থ আত্মায় মানুষ হচ্ছি না! এমনকি অনুসরণকারী যথার্থ মুসলিমদের, অতীত জীবনাদর্শও অনুসরণ করছি না সঠিকভাবে!

মুসলমান হিসেবে সুন্দর সুন্দর মসজিদ তৈরী করে, সুসজ্জিত-সুন্দর করে সাজিয়ে, বিশেষ বিশেষ দিনগুলেতে রাশি রাশি টুপি পাঞ্জাবীর লাইনে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটালেই মুসলিম নামের স্বার্থকতা আসবে না। না প্রকৃত ইসলামের সাথেও এর সংগতি লাভ বা স্বার্থকতা আসবে। সারা জীবন ধর্মহীন অবস্থায় কাটিয়ে অপকর্ম কুকর্ম এবং অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করে জীবনের প্রথম ভাগ, মধ্য ভাগ কাটিয়ে বৃদ্ধাবস্থায় আমরা দাড়ি, টুপি পরিধান করে পবিত্র কাবাশরীফ গিয়ে হজ্ব করে এসে প্রচার করছি! নামের সাথে সংযুক্ত করছি আলহাজ্ব!

ধিক! আমাদের মানসিকতাকে! ধিক! এমন লোক দেখানো মুসলমানিত্বকে! ধিক! এমন ভবিষ্যতাকাঙ্খি মানুষদেরকে!

ধর্মকে শিকেয় তুলে না রেখে এখনি নিবিষ্ট হোন বিধানাবলি পালনে! যারা বৃদ্ধ বয়সে এসেই পড়েছেন তারা সব সময় শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালার স্মরণে নিযুক্ত থাকুন এবং ক্রন্দন করুন! হয়ত মহান দয়ালু আল্লাহ! ক্ষমা করে দিবেন। অন্যথায় শুধু পাঁচ ওয়াক্ত লোক দেখানো নামাজ এবং টুপি-পাঞ্জাবী পড়ে হাটে-বাজারে ঘোরাঘুরি করলেই সত্যিকার ভাবে মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমান পৃথিবীর দূরাবস্থা, পরিস্থিতি আর দুঃখজনক পরিণতির জন্য মুসলমানেরাই দায়ী। মহান নবী (স.) বিদায় ভাষনে স্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন দুইটি বিষয়কে আকড়ে ধরে জীবন পরিচালনার জন্য। আমরা কি কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আমার নিজ নিজ ব্যক্তি জীবনটুকুও পরিচালনা করার চেষ্টা করছি?

সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী পরের বিষয়! আগে আমি ব্যক্তি! ব্যক্তি পর্যায়টুকুও কি আমরা যথার্থভাবে ইসলাম দ্বারা সু-সজ্জিত করতে পেরেছি?

পৃথিবীতে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে যে সময়টাতে সে 'সালাত' বা নামাজে মগ্ন থাকে অথচ এর যথাযোগ্য মর্ম আমরা বুঝিনা এবং চেষ্টাও করি না! অধিকাংশ নামাজীরা বেয়াদবের মত আচরণ করছি। অথচ আমরা বছরের পর বছর ধরে নামাজ/ সালাত আদায় করছি! নবী মুহাম্মদ (স.) উনার উম্মত দাবী করে জীবন কাটিয়ে শেষ দিকে ধাবিত হচ্ছি কিন্তু উনার যথার্থ আদর্শিক জীবন সাজিয়ে অনুসরণ অনুকরণ করে প্রকৃত উম্মত হয়ে উনাকে চিনতে পারি নি! অথচ মা বাবা স্ত্রী পুত্রের চেয়েও বেশি তাকেই চেনার কথা, দেখার কথা, উনার পরামর্শ ও আত্মিক সাহায্য নেওয়ার কথা! অথচ এসব বিষয়াবলি সম্পর্কে কোন জ্ঞানই আমাদের নেই।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আমাদেরকে ক্ষমা করুন!

হে আল্লাহ্! আপনার সৃষ্ট পৃথিবীর শত শত কোটি মানুষদের মধ্যে, ধর্মানুসারীদের মধ্যে (বর্তমানে বিভক্ত) ইয়াহুদি খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদের জন্য আপনার নির্ধারিত বান্দা ইব্রাহীমের (আ) কথা স্মরণ করছি।

মুসা (আ), ঈসা (আ) এবং মুহাম্মদ (স) এবং সমষ্টিগত ভাবে উক্ত মহান নবীদের সকল অনুসারীরা যাকে পিতা হিসেবে স্বীকার করেন এবং যিনি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করে আপনার ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম নামে পরিচয় প্রদান করে তার অনুসারীদের/ সন্তানদের মুসলমান নাম নির্দিষ্ট করেছেন!

- ধারাবাহিক ভাবে মুসা (আ) ইসলাম প্রচার করে মুসলমান নামে আত্মপরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও আজ মুসা (আ) এর অনুসারীরা পরবর্তীতে প্রেরিত ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (স) কে স্বীকার করে নিজেদেরকে ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলিম নামে পরিচয় দেন না।
- ঈসা (আ) ইসলাম ধর্মের প্রচার করে নিজেকে শুদ্ধ আত্মার যথার্থ মুসলিম হিসেবে পরিচয় এবং অনুসারীদের শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও তার অনুসারীরা পরবর্তী নবী মুহাম্মদ (স) কে স্বীকার করে ইসলামের অনুসারী হয়ে মুসলিম নামে পরিচয় দেন না।
- মুহাম্মদ (স) ইসলামের প্রচার প্রসার এবং পরিপূর্ণতার দ্বারা পূর্ণ মুসলমানের প্রকৃত চিত্র এবং স্বরূপ দেখানো সত্ত্বেও আজ বর্তমানের মুসলমানেরা

বংশগত সূত্রে ইসলাম আর মুসলমানিত্ব অর্জন করেছে মাত্র! তারা আজ ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমান জাতীর স্ব-বৈশিষ্ট সম্পর্কেও অজ্ঞ।

হে আল্লাহ্! ইব্রাহীম (আ) কে মুসলমান জাতির পিতা এবং ইসলামের প্রবর্তক হিসেবে নির্দিষ্ট স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বে যুবক ইব্রাহীমের জ্ঞান, কর্ম এবং আপনার সকাশে তার মনোবাঞ্ছা কেমন ছিল বিশ্ববাসীরা জানলেও শুধুমাত্র গল্পতেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তারা তার যথার্থ রূপ সন্ধান করেন না! যুবক ইব্রাহীম উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল!

কে তার স্রষ্টা! কে তার মাতা-পিতার স্রষ্টা! কে এই পৃথিবীর স্রষ্টা! কে এই পৃথিবাসীদের স্রষ্টা! কেন তিনি স্রষ্টা!

যাদেরকে স্রষ্টা স্বীকার করা হচ্ছে সেই দেব-দেবীরা স্রষ্টা হতে পারে না! কি কি কারণে মুর্তি প্রতি-মুর্তিদের স্রষ্টা মানা সম্ভব নয় তিনি তা যথার্থ অনুধাবনে মগ্ন ছিলেন। মহান স্রষ্টা কেন সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করেছেন! ইত্যাদি ভাবনায় তিনি ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। কখনো চন্দ্র সূর্য, তারকা ইত্যাদিকে স্রষ্টা ভেবেছেন কিন্তু তার সত্যানুসন্ধানি ভাবনা এসব সৃষ্টিকে স্রষ্টা হওয়ার যৌক্তিক কারণ দেয়নি।

যুবক ইব্রাহীম কোথাও সৃষ্টিকর্তাকে খুজে না পেয়ে বিমর্ষ উদভ্রান্তের মতো নিজ অশ্রু আর মস্তককে নিরাকার স্রষ্টায় বিনীত করেছেন, আত্মবিসর্জন দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাদশাহ্ নমরুদ ইব্রাহীমের উদ্দত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের সময়ও ইব্রাহীম স্থির ছিলেন এই প্রত্যয়ে যে, নিরাকার মহা-পরাক্রমশালী যিনি কখনই কারোর সহিত সাদৃশ্য পূর্ণ নন এবং সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত নয়। যার অসীম বড়ত্ব ও সম্মানের সহিত কোন সৃষ্টি সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে না, তিনি অবশ্যই তাকে রক্ষা করবেন (যদি রক্ষা না করেন তাহলে দায় তারই)।

এরপর মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্' কি করেছেন পৃথিবীর সমস্ত ইয়াহুদী খ্রিষ্টান এবং মুসলমানেরা যতই হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত থাকেন না কেন প্রত্যেকেই স্বীকার করেন এবং জানেন। মহান আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে (আ) নবুয়ত দিয়েছেন, রাজত্ব দিয়েছেন, খলিল উপাধী দিয়েছেন এবং মহা-সম্মানে সম্মানিত করবেন ঘোষনা দিয়েছেন। আমরা মানুষেরা যদি আত্মবোধহীন হই তবেই উপলব্ধিহীন হতে পারি।

হযরত ইব্রাহীম (আ) এর পরে একটা উদাহরণ শুধু মুসলমানদের জন্য নিদৃষ্ট করছি। অন্য কেউ গ্রহণ করলে করতে পারেন! মুহাম্মদ (স) কে আল্লাহ্তা'য়ালা

সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি/ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এমন কি তার অনুসারীরা তেমনি শ্রেষ্ঠ অনুসারী হিসেবে সম্মান পাবেন। মহা মানব মুহাম্মদ (স) নবুয়াত লাভ করার পূর্বেও (৪০ বছরের পূর্বে) কেমন জীবনাচারের মানুষ ছিলেন আমরা সবাই জানি কিন্তু ভাবিনা। তিনি ব্যক্তি জীবনে কোনদিন মিথ্যে কথা বলেননি। অন্যের ক্ষতির মাধ্যমে অবৈধভাবে কোন সম্পদ উপার্জন করেননি। অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দেননি। কাউকে গালি দেননি। আমানত রক্ষা করেছেন। অশ্লীলতার বিন্দু মাত্রও তার চরিত্রে ছিল না। সারাজীবনে তিনি কারও উপকার ব্যতীত সামান্য ক্ষতিটুকুও করেননি। মানুষকে সাধ্যমতো দান ও সহযোগিতা করেছেন। অশ্লীলতার যুগে (আমরা যাকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলে গালি দেই) ২৫ বছরের একজন তরুন কর্তৃক ৪০ বছরের বিধবা মহিলাকে বিয়ে করা এবং উক্ত মহিলার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন বিয়ে না করাকে আপনি কিভাবে ভাবেন!

নিজ পরিবারের প্রতি কর্তব্য, নির্লোভ মানষিকতা এবং স্ত্রীর মানষিকতাকে তিনি বড় করে দেখেছেন। তার ব্যক্তিগত কাজের লোকের প্রতি জীবনে একটা কুটু কথা পর্যন্ত বলেননি।

গরু খাওয়া পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ কাটা আর লোক দেখানো হিজাবপড়া মানুষের দল! ভাবো! যদি মুসলমান হতে চাও! অন্যথায় কপালে দুঃখ আছে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী পরবর্তী জীবনে।

▶▶ পৃথিবীর দুঃখ দুর্দশা আর মহামারীগুলো কি আমরা মুসলমানেরা বুঝতে পারছি? মুসলমানদের মধ্যে কথিত লোক দেখানো বাহ্যিক হিজাব পড়া/ হিজাবধারী নারীদের কারনেও আমাদের সমাজে চরম অনাচার নৈরাজ্য এবং অপরাধ ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক লোক দেখানো হিজাবধারী নিজেকে আবৃত করে নানা প্রকার অপরাধে জড়াচ্ছেন। নিজেকে আবৃত করে যৌনকর্মে জড়াচ্ছে, পতিতাবৃত্তিতে যাচ্ছে। ছিনতাই চুরি ডাকাতি আর মাদকদ্রব্য বহন করছে। মুসলিম মহিলা বেশে এরা এমন কিছু করছেন যা চরম দুঃখজনক ও লজ্জাকর। পুরুষেরা তো মাঝে মধ্যে ২/১ ওয়াক্ত নামায পড়েন কিন্তু হাজারো বাহ্যিক হিজাবধারী মহিলা আছেন যারা দিনে এক ওয়াক্ত নামাজও পড়েন না! ইসলাম ধর্মে/ কোরআন শরীফে পর্দা সম্পর্কে যে নির্দেশনা দেয়া আছে এসমস্ত মহিলারা তা মানেন না বরং মুখোশ ব্যবহার করে তারা এমন কিছু করছেন যা বোধহয় অনাবৃত/ হিজাব না থাকলে করা সম্ভব হতো না। আসলে তারা হিজাবের অপব্যবহারের মাধ্যমে ইসলাম এবং পর্দার প্রকৃত সম্মান নষ্ট করছেন।

সব মিলিয়ে লোক দেখানো বংশীয় মুসলিম নারী পুরুষদের কারনেই আজ সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের নানারূপ দুরাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলামের যথার্থ অনুসরণ না করার ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমরা মুসলিমরা নিজেদের পাপ ভোগ করছি মাত্র। দুরাবস্থায় পতিত যে সব মুসলিম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অভিযুক্ত করেন/ গালি দেন তারা প্রকৃত পক্ষে চরম মূর্খ এবং পাপিষ্ঠও বটে!

সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে মুসলিমরা আজ কতটুকু জানেন এবং ভাবেন!

মুহাম্মদ (স.) হেরা গুহায় দীর্ঘদিন দিবা-রাত্র কাটিয়েছেন। খাওয়া নেই ঘুম নেই ক্লান্তি নেই সবকিছুকে ত্যাগ করে বিমর্ষ এক অজানা ভাবনায় মগ্ন থেকেছেন। প্রাণ প্রিয় স্বামীর জন্য খাদিজা (রা) সু-উচ্চ হেরা পাহাড়ে উঠে খাবার দিয়ে শুন্য একা একা ফিরে এসেছেন অশ্রুসিক্ত নয়নে। মুহম্মদ (স) কি শুধুমাত্র হেরা পাহাড়েই ধ্যান করেছেন?

মুহাম্মদ (স) হেরা পাহাড়ে গিয়েছেন একেবারে সবশেষে, যখন তিনি কোথাও কোনরূপ মনের শান্তি পাচ্ছিলেন না, যখন তিনি বিভিন্ন কাজ কর্মের ফাকে বিভিন্ন স্থানে মহান স্রষ্টা আল্লাহর ভাবনায় নিবিষ্ট হতে পারছিলেন না তখনই তিনি নির্জন হেরা পাহাড়কে বেছে নিয়েছেন। চারদিকের সমাজ মানুষের অন্যায় অত্যাচার অবিচার জুলুম সুদ, হত্যা, অত্যাচার, কারও নৃত্য উল্লাস, কারো রাজত্ব, কাহারো আর্তনাদ ইত্যাদি হতে কিভাবে মানব সমাজ মুক্তি পেতে পারে! কিসের দ্বারা মানুষেরা তাদের জীবনে সুখি, সফল এবং মননে এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে! ইত্যাদি ভাবনায় নিবিষ্ট থেকেছেন।

মুহাম্মদ (স) মহান একক অদ্বিতীয় আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থেকেছেন এবং চারদিকের প্রতিবেশ পরিবেশে বিপন্ন মানুষ গুলোর প্রতি তার কর্তব্য এবং মহান স্রষ্টার ইচ্ছা মূলক যথার্থ মুক্তি কামনা করেছেন। ইব্রাহীম (আ) আল্লাহতা'য়ালার পরিচয় জ্ঞান সম্পর্কেও অজ্ঞ ছিলেন কিন্তু মুহাম্মদ (স) হাতে গোনা কয়েকজন একত্ববাদী তাওরাত ইঞ্জিলের অনুসারী এবং সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের একত্ববাদী আব্দুল মুত্তালিব, আবুতালিব, মা আমেনার নিকট হতে মহান স্রষ্টা আল্লাহর নাম পরিচয় এবং বিধানাবলী সম্পর্কে মৌলিক (শোনা, আলোচনায় মানষিকভাবে) জ্ঞান পেয়েছেন। এবং সেই একক মালিকের তরে বিনীত আর্তি, প্রার্থনাকে নিবেদন করে নিজের এবং সমাজের সামগ্রিক মুক্তি কামনা করেছেন!

তৎকালিন ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানরা যারা মুসা ও ঈসা (আ) এর অনুসারী হিসেবে দাবি করত তারা কাবা গৃহে ৩৬০টি মুর্তি স্থাপন করে পূজা শুরু করেছিল এবং প্রতি বছর হজের মৌসুমে লাখ লাখ লোক সমবেত হয়ে নৃত্য জুয়া, মেলা, মদ্যপান এবং কাবাঘরের তাওয়াফে অংশ নিত সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়। অথচ এগুলোর কোনটাই তাওরাত ইঞ্জিল দ্বারা নির্দেশিত ছিল না। তাওরাত ইঞ্জিলের মৌখিক অনুসারীরা তাদের কিতাবের অংশ বিশেষ বিকৃতি সাধন করে একত্ববাদের বিরোধী 'মুশরিক' হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থাপিত করেছিল। চারদিকের এসব আত্মবিধ্বংশী দৃশ্যাবলী এড়িয়ে মানুষের মুক্তির আশায় মুহাম্মদ (স), মুসা (আ), ঈসা (আ) এর রব নিরাকার আল্লাহ্‌তা'য়ালার স্মরণে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন। এই অবস্থায় তিনি মানষিক ভাবে এক অজানা আনন্দ তৃপ্তি পেতেন। ক্রমাগতই তিনি নির্জন স্থানে এক আল্লাহকে ডাকতেন এবং প্রার্থনা কান্নায় অসীম ক্ষমতাধর আল্লাহর প্রতি প্রার্থনায় নিজের করণীয়, কাম্য এবং মুক্তি সন্তুষ্টি কামনা করতেন। শেষ পর্যায়ে আল্লাহতে নিমগ্নতা এত বেড়ে গিয়েছিল যার কোন উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এরপর কিভাবে মুহাম্মদ (স) নবুয়ত পেলেন এবং ঈসা ও মুসা (আ) এর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের পূনঃ প্রচার করলেন এবং যথার্থ মুসলিম হিসেবে মুসলমানের শিক্ষা ও অর্জনকে পরিপূর্ণতা দ্বারা প্রতিষ্ঠা করলেন তা আমরা জানি। কিন্তু জানিনা, বুঝিনা এর সারাংশ!

ইব্রাহীম (আঃ) মুসা (আঃ) ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সঃ) নবুয়াত বা নবীত্ব লাভ করার পূর্বে কখনো কল্পনাও করেননি যে, উনারা নবী হবেন! মহান কিতাব লাভ করে মানুষদেরকে আহ্বান করবেন মহান আল্লাহর দিকে! ইব্রাহীম (আঃ) মুসা (আঃ) ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সঃ) নিজ আত্মায় মহান আল্লাহতায়ালার এতটা স্মরণকারী, সত্য সঠিক পথ প্রত্যাশী/ মহান স্রষ্টামুখি বিনীত হয়ে ছিলেন/ হওয়ার কারনে, উনাদেরকে আল্লাহ "মহান নবী" হিসেবে মনোনীত করেছেন। মহান 'আল্লাহ' জানতেন (পূর্ব থেকেই) যে, তাহারা নবী হবেন! আল্লাহ অযোগ্য অ-পাত্রে 'নবীত্ব' দান করেননি। আপন ইচ্ছায় উক্ত নবীগণ যথাযোগ্য হয়ে উঠেছেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই!

মহান 'আল্লাহ'র সাহায্য/ ইচ্ছার মাধ্যমে উক্ত নবীগণ মহা সম্মানীত হয়ে উঠেছেন এবং্ অল্লাহ পরিপূর্ণ সম্মানিত করেছেন।

হে মুসলমান! ভাবো! তোমার স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি বিনীত হও! কাদো! প্রার্থনা করো! মুক্তি চাও! পথ প্রার্থনা করো!

সরল সঠিক পথের প্রার্থনায় অশ্রুঝরাও! তবেই তুমি মুক্তি পেতে পারো। অনুস্মরণ করো! যারা অনুসারী হয়েছে! স্মরণ করো! যারা স্মরণ করে স্মরনীয় হয়েছেন!

সার্বজনীন কিছু ভালো-কর্ম যেগুলোকে আমরা অবশ্যই মানব। কেননা এই ভালো কর্মগুলো পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য প্রতিটি ধর্মেরই এক একটি অংশ এবং সত্যিকার যে ধর্মটি মহান স্রষ্টার ইচ্ছার বাস্তবায়নকারী রূপে পৃথিবীতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার অন্যতম মূল বিষয়। এবং এই কর্ম/ গুণ গুলো ব্যতীত ধর্ম অর্থহীন। অর্থাত প্রতিটি ধর্মেই এই বিষয়গুলি উল্লেখিত হয়েছে।

আবারও পূনরাবৃত্তি করছি বিষয়গুলোকে ঃ

১. সত্য কথা বলা, মিথ্যা কথা যেন না বলতে হয় এজন্য সতর্ক থাকা।
২. বৈধ উপার্জন করা, খাওয়া, অন্যের ক্ষতির মাধ্যমে কোন উপার্জন না করা।
৩. সৎ-সংগত ও যৌক্তিক আচরণ করা এবং এর উল্টো কাজগুলোকে ঘৃণা করা।
৪. প্রার্থনাকারীকে সাধ্যমত সাহায্য করা, না পারলে বিনীত ভাবে বলা/ ভালো কামনা করা।
৫. নিজেকে সবচেয়ে ক্ষুদ্র ভাবা, অহংকার হিংসা বিদ্বেষ না রাখা। সর্বদা সকল মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণিদের মঙ্গল কামনা করা, ভালো ধারণা পোষণ করা, ভালো পরামর্শ দেওয়া। সৎ, সঙ্গত বিষয়কে সৎ এবং সঙ্গত হিসেবেই দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করা, ভালো মানুষদের সঙ্গে থাকা।

মানুষের আত্মার বক্তব্য/ ভাব একমাত্র আল্লাহ জানেন এবং তার ভাব অনুযায়ী মানুষকে পরিচালিত করেন ভালো অথবা মন্দপথে। সুতরাং আমাদের মানুষদের আত্মা এতটা কুলসতা পূর্ণ, কালিমা লেপন যুক্ত করা যাবে না যাতে আমার আত্মাধারী (আমি মানুষটি) সঠিক পথে আসার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলি/ পথভ্রষ্ট হই। সার্বজনীন কিছু ভালো কর্ম/ উপরোক্ত কর্মগুলো দ্বারা আমাদের মানব চরিত্র সুশোভিত করতে হবে।

মুসলমানেরা জানেন আবু জেহেল, উতবা, সায়বা, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান, উমর, ইকরামা, হিন্দা ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম। উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারা পথ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং কাহারা জালিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে আমরা জানি। শুধু মাত্র তাহারা নহে, আরো হাজারো ব্যক্তি বর্গ ছিলেন যাহারা প্রাথমিক

অবস্থায় ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করলেও পরবর্তী জীবনে ইসলামে প্রবেশ করেছেন।

প্রকৃত যালিম কাহারা?

যাহারা তার নিজ আত্মাকে স্বরূপে পরিচালিত করে না, আত্মার জন্য হিতকর ভালো কাজগুলো করে না। যে মানুষটি মহান আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছা অনুযায়ী আত্মাকে পরিচালিত না করল সে প্রকৃত পক্ষে তার নিজ আত্মার উপর জুলুম করল। আত্মার যথার্থতা যদি দেহটি দ্বারা অর্জন না করা যায় তাহলে এটিই বড় জুলুম/ বড় অন্যায়/ প্রকৃত অর্থে তাহারাই যালিম।

পৃথিবীর সকল সঠিক-যথার্থ-সঙ্গত ভালো কর্মগুলো আত্মার যথার্থতায় সহায়ক।

সুতরাং আমাদের ভাবতে হবে!

উমর ইকরামা আবু সুফিয়ান ওহাইশি হিন্দাকে আল্লাহতায়ালা পথে আনয়ন করেছেন মানবীয় কিছু গুণের কারনেই। তাদের চরিত্রে এমন কিছু ভালো গুণাবলি ছিল যার কারনে তারা চিরকালীন যালিম/ আগুনে পোড়ার মত অভিশপ্ত হওয়ার স্তরে পৌছায়নি। যদিও উক্ত সাহাবিগণের সঙ্গীরা অনেকেই যালিম/ কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।

বছরের পর বছর পতিতালয়ে শুয়ে বসে যৌন কর্ম করে মদ্যপান করার পরও অনেক মানুষ আল্লাহর প্রিয় মানুষ হতে পারে আবার পথ প্রাপ্ত মানুষেরাও পথভ্রষ্ট হতে পারেন, তাদের নৈতিকতা বিরোধী কিছু অপকর্ম/ কু-কর্মের কারণে।

⏩ মানুষ যখন পৃথিবীকে ভালো কিছু দেওয়ার, পৃথিবী হতে ভালো কিছু নেওয়ার, পৃথিবীতে বসবাস করার প্রয়োজনীয়তা, পৃথিবীতে বসবাস করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে অথবা যোগ্যতা শেষ হয়ে যায় এবং সেই সাথে পৃথিবী পরবর্তী জীবনের প্রয়োজনীয়তা, গ্রহণ করার/ প্রবেশ করার, দেওয়া/ নেওয়ার, পরকালীন প্রাপ্তি/ ফল ভোগ, পৃথিবীর প্রাপ্তির চেয়ে বেশি হয়/ বড় হয় অথবা হয়ে উঠে, তখনই একজন মানুষের পৃথিবীয় জীবনের ইতি ঘটে।

অর্থাত, পৃথিবীর জীবন ঃ পরকালীন জীবন।

এই ব্যালেন্স/ সমতা রক্ষার পাল্লা যেদিকে ভারি হবে/ ঝুকে পড়বে, আত্মাধারী মানুষটি সেখানে অবস্থান করবে/ প্রস্থান করবে।

সুতরাং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ইচ্ছা, ভাব সবই মহান স্রষ্টামুখি করতে হবে, অন্যথায় যে কোন সময় আমরা মৃত্যুবরণ করতে পারি অনিচ্ছা এবং অজ্ঞাতসারেই! এখনও সময় আছে আমাদের উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে! হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং পথ প্রদর্শন করুন!

যাহারা মনে করেন আমি সৎ পথে আছি এবং উপরোক্ত আলোচ্য মানবীয় গুনাবলীর সমষ্টি তাদের চরিত্রে বিদ্যমান তারা অবশ্যই মহান এবং সোভাগ্যবান। উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রশংসা করছি।

পরিপূর্ণ মুসলিমদের মাধ্যমেই উপরোক্ত গুনাবলী গুলো যথার্থভাবে প্রকাশ পেতে পারে! ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়! মুসলিমকে আত্মসমর্পণকারী বলা হয়! মুসলিম ব্যক্তি যখন যথার্থভাবে ইসলামের মাধ্যমে স্রষ্টা 'আল্লাহ'তে আত্মসমর্পণ করবে তখনই ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। উক্ত কয়েকটি বিষয় তারই সামান্য অংশ মাত্র!

যে সমস্ত মানুষদের জীবনে আলোচ্য মানবীয় গুনাবলীর সমষ্টি বা আংশিক অথবা বিন্দু মাত্রও নেই তারা চেষ্টা করি, উক্তরোক্ত গুনাবলীগুলো অর্জন করার। একজন মানুষের জীবনে অবশ্যই এই বৈশিষ্টগুলো থাকতে হবে যে ধর্মেরই অনুসারী আমরা হই না কেন!

নতুবা আপনার পথ সৎ হলেও আপনি অসৎ এবং অমানুষ, হতভাগ্য সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই নন! যারা দ্বিধাদন্দে এবং মন্দ পথে আছেন তারা ন্যূনতম উক্ত বৈশিষ্টগুলো অর্জন করুন বা করার চেষ্টা করুন!

আল্লাহর কসম! কসম! কসম! আপনার জন্ম, জীবন, সমস্তই স্বার্থক হবে! সমষ্টিগত ভাবে প্রতিটি ধর্মের প্রতিটি মানুষের প্রতি বিনীত আহবান, আপনি এরূপ প্রার্থনা প্রায়ই করার চেষ্টা করুন এবং আপনার পালনীয় ধর্মের প্রতি মনোযোগী হোন! আপনার ধর্মের বিধানাবলীর প্রতি মনোযাগী হোন। আপনাকে মনোযোগী হতে হবে ধর্মের বাহ্যিক বিধানের প্রতি যেগুলোতে সমাজ সংসার রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট বা পরিবার সমাজ স্বজন, রাষ্ট্র ইত্যাদির প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য এবং বিধানাবলীর নির্দেশনা আছে। ধর্মের বাহ্যিক বিধানাবলী এবং আপনার প্রতি আপনার ধর্মের নির্দেশনাবলী, পালনীয় কর্তব্য ইত্যাদির সমষ্টি যথাযথ অনুসরণ করার চেষ্টা করুন! ধর্মের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা আপনার নিকট কেমন ইবাদত আনুগত্যের নির্দেশনা দিয়েছেন তা সম্পর্কে ভাবুন। আপনার ধর্মের বিধানাবলী দ্বারা সমাজ রাষ্ট্র পরিবার কতটুকু উপকৃত হচ্ছে বা সমাজ রাষ্ট্রের কতটুকু মঙ্গল

হওয়া সম্ভব যথাযথ যৌক্তিকতা যাচাই করার চেষ্টা করুন। আপনার ধর্মের আভ্যন্তরীন অর্থাৎ ধর্মের মূল বিষয়াবলী এবং মূল বিষয়াবলীর আভ্যন্তরীন অর্থাৎ গুঢ়ার্থ সম্পর্কে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

সবমিলিয়ে আপনার অনুসরণীয় ধর্মের অনুশাসন এবং যাবতীয় বিধানাবলী সম্পর্কে সাধ্যমত জ্ঞান আহরনের চেষ্টা করুন এবং এসব জ্ঞানের দ্বারা/ বিধানাবলী দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় উপযোগীতা/ স্বার্থকতা সফলতা এবং সেই সাথে অনুসরণ না করলে কি পরিমাণ ক্ষতি বা বিপর্যয়ের আশংকার সম্মুখিন হতে হবে বা হচ্ছি তা নিয়ে যখনই সময় পান ৫/ ১০/ ১৫/ ২০ মিনিট ভাবার চেষ্টা করুন। অবশ্যই অবশ্যই জীবন জগৎ সম্পর্কে আপনার ধর্মের দর্শন/ দৃষ্টি ফুটে উঠবে এবং আপনার নিজের দৃষ্টি উন্মোচিত হবে। এই বিষয়ে কোন শিক্ষক/ ধর্মগুরুর কোনরূপ সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

আপনি যে কোন ধর্মের অনুসারী হতে পারেন তবে, বর্তমান বিশ্বে আলোচিত এবং নানাবিধ কারণে মানুষের ভাবনায় যে ধর্মটির নাম উঠে এসেছে সেই 'ইসলাম' ধর্মটি সম্পর্কে সাধ্যমত জানার চেষ্টা করুন এবং ইসলাম ধর্মের বিধানাবলীর সহিত আপনার ধর্মের বিধানগুলোর পার্থক্য এবং সাদৃশ্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন! ধর্মীয় দিক থেকে ইসলাম ধর্মের সহিত আপনার ধর্মের পার্থক্য নিরূপন করার চেষ্টা করুন! পার্থক্যগুলো কি কি এবং কেন? সাদৃশ্যগুলো কি কি এবং কেন? এই প্রশ্নগুলো করুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজার চেষ্টা করুন নিজে নিজে। মহান স্রষ্টামুখি হয়ে স্রষ্টা আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন বিনীত এবং আন্তরিক ভাবে; আশা করা যায় আপনার উপর মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার অসীম অনুগ্রহের বিন্দু পরিমাণ হলেও বর্ষিত হবে। মানুষ হিসেবে "মানব-জীবন" যথার্থ সঠিক এবং মঙ্গলজনক হয়ে উঠবে।

হে স্রষ্টা! হে আল্লাহ্!
আমরা যেন প্রত্যেকে মনস্কামনায় উদ্দীপ্ত হই মুক্তির একমাত্র লক্ষ্যে-
"স্রষ্টায় বিনীত সহজ সঙ্গত জীবন
পরিচ্ছন্ন হৃদয় শুদ্ধ আত্মায় উন্নয়ন।"

***